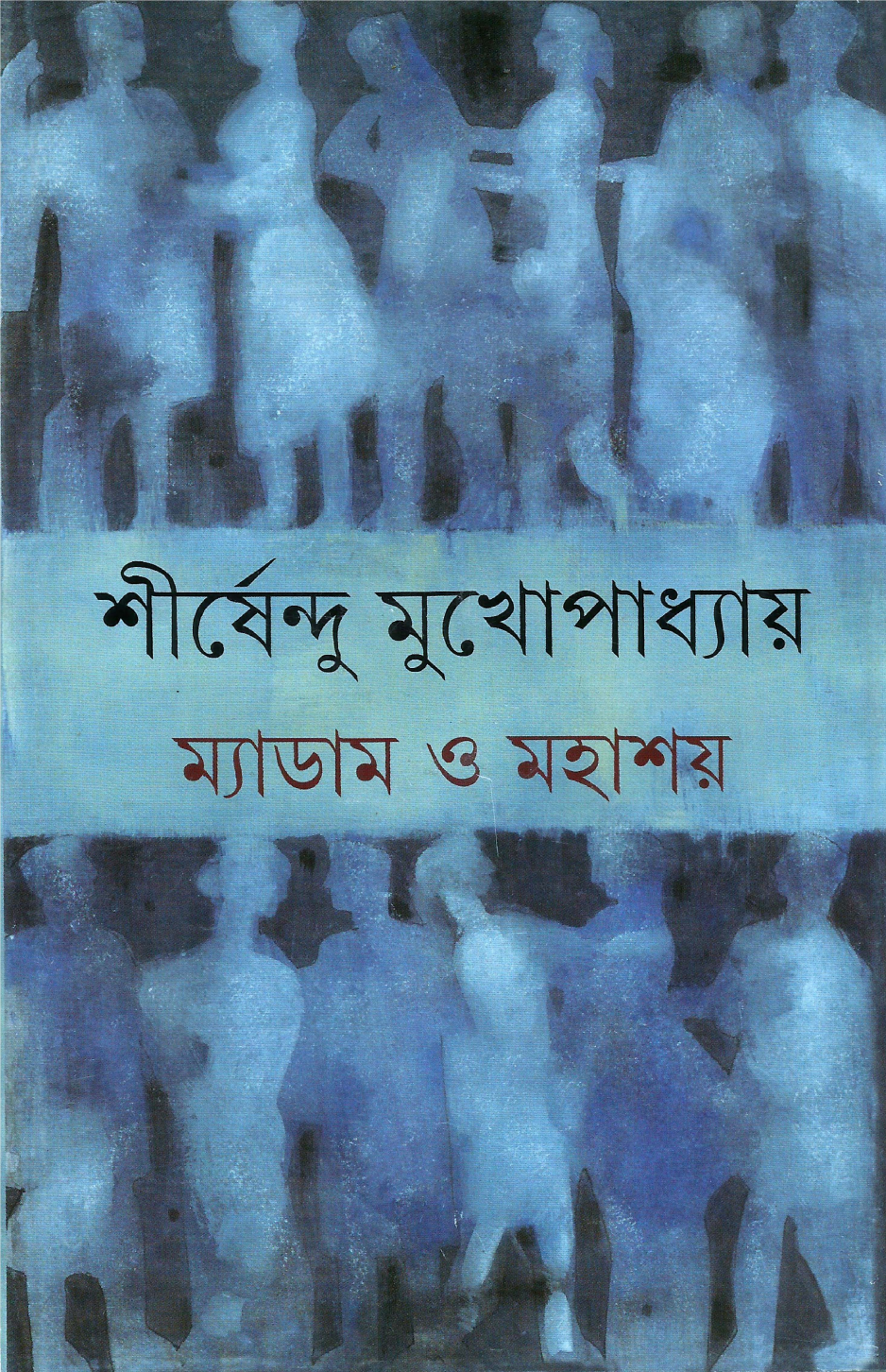

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ম্যাডাম ও মহাশয়

সুমিতের বাবা রজতশুভ্র এক বছর আগে এক ভোরবেলা নিরুদ্দেশ হয়ে যান। সুমিত গোয়েন্দা বৈদূর্যকে নিয়োগ করেছে বাবার নিরুদ্দেশ-রহস্যের উন্মোচনে। বৈদূর্য তেমন সফল হয়নি, তবে তার ধারণা সুমিতের মেয়ে মিমি সব জানে। গোপাল সেনের পরামর্শে গরিব, মেধাবী আয়ুষ্মানের নতুন নাম হয় জোয়ার। সুমিতের গাড়ি চালানোর কাজ পায় সে। ওদিকে গোপাল সেনের বউ নন্দিনী বুধাদিত্যকে খুন করার জন্যে ভাড়া করে লোক। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ম্যাডাম ও মহাশয়' উপন্যাসে জীবনের জটিল ডালপালা। বাবা রজতশুভ্রর খোঁজ পাবে কি সুমিত? বুধাদিত্য কি মোহময়ী নন্দিনীর চক্রান্তে খুন হবে শেষপর্যন্ত? কার জন্য শরীরে শিহরন জাগে আয়ুষ্মানের? মানবমনের সমস্ত জটিল পথের শেষে তবু অপেক্ষা করে থাকে চিরন্তন এক মঙ্গলঘট।

১৫০.০০

.....

ISBN 978-93-5040-339-6

ম্যাডাম ও মহাশয়

ম্যাডাম ও মহাশয়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৪

© শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-339-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

MADAM O MAHASHAY
[Novel]
by
Sirshendu Mukhopadhyay
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

“রা–স্বা”
বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রীসুবোধ বাগচী
শ্রীমতী কৃষ্ণা বাগচী
করকমলেষু

ব্যস, ব্যস রোককে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই আটাচাক্কির সামনে দাঁড় করাও!

গাড়িটা ফ্যাঁস করে দাঁড়াতেই সুমিত নেমে পড়ল। ঝুঁকে বেশ চুলচেরা চোখে দেখল, ফুটপাতের ধারে কতটা ঘেঁষে পার্ক করতে পেরেছে ছোকরা। সঙ্গে স্কেল নেই। কিন্তু তবু আন্দাজ করল, ছয় ইঞ্চিরও কম ফাঁক। শুধু গুড বললে হবে না, ভেরি গুড।

ফের সিটে উঠে পড়ল সুমিত।

চালাও।

সামনেই বড় রাস্তার মুখ। সামনে অন্তত চোদ্দো-পনেরোটা গাড়ি থেমে আছে। তার গাড়িও থামল। ঘ্যাঁচ করে পিলে চমকে দিয়ে নয়, আগে থেকে স্পিড কমিয়ে মোলায়েম ভাবে থামা। এবং সামনের গাড়িটা থেকে অন্তত ফুট চারেক ফাঁক রেখে। ওই গাড়িটা যদি কোনও কারণে আটকে যায় তাহলে পাশ কাটানোর স্পেস যাতে থাকে। হ্যাঁ, বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান।

কাণ্ডজ্ঞান আছে।

সিগন্যাল পেয়ে সামনের গাড়িটা চলতে শুরু করেছে। তার গাড়িও চলল। বাঁয়ে ঘুরল এবং একটি গাঁক গাঁক করে আসা মিনিবাসকে আগে যেতে দিয়ে তারপর বড় রাস্তায় ঢুকল। দুটো অটো দু'দিক থেকে এসে তাদের গাড়ি কাটিয়ে এগিয়ে গেল। কোনও পাঙ্গা নিতে গেল না ছোকরা। ভাল ড্রাইভার জানে, তার দান পরে আসবে।

বাসন্তী স্টোর্সের সামনে আর-একবার গাড়ি পার্ক করাল সুমিত, নামল। এবং দেখে অবাক হল, অলমোস্ট জিয়োমেট্রিক প্রিসিশানে

ফুটপাতের ঠিক ছয় ইঞ্চির মধ্যেই ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। জার্ক দেয়নি। আপনমনেই সে এক সন্তোষজনক হুঁ দিল।

গ্যারেজে গাড়ি ব্যাক করে ঢোকাতে বলেছিল। ছোকরা সেটা অনায়াসে করল একবারেই, আগুপিছু না করে। সুমিত গ্যারেজে ঢুকে দেখেছে, দুই দেওয়ালের একদম মাঝামাঝি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বড়জোর দুই-তিন ইঞ্চির ডান-বাঁ হয়ে থাকতে পারে।

খুশি হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে সুমিতের। ছোকরা ভাল চালায়। বেশ ভাল চালায়। এমনকী খুব ভাল চালায়ও বলা যেতে পারে।

কিন্তু অখুশির কারণও থাকছে। পৃথিবীর কোনও কিছুই তো আর নিষ্কণ্টক নয়। প্রথম কথা, ছোকরার বয়স। ডেনজারাস। মাত্র বাইশ। দ্বিতীয় কারণ, চেহারা। ছোকরা লম্বা, হাড়ে-মাসে অ্যাথলেটিক শরীর এবং বেশ হ্যান্ডসাম। এবং সে, সুমিত, পনেরো বছর বয়সি একটি ফুটফুটে মেয়ের বাবা। দুনিয়ার তাবৎ পঞ্চদশীর বাবাদের মতোই তারও প্রবল বীতস্পৃহা রয়েছে কুড়ি-বাইশ বছরের হ্যান্ডসাম ছোকরাদের প্রতি। স্ট্যাটাস ড্রাইভার হলে কী হবে! সেই যে কী যেন একটা বাংলা সিনেমা হয়েছিল আর তাতে একটা জঘন্য গান ছিল, ভদ্দরঘরকা লেড়কি ভাগে ডেরাইভারকা সাথ...

মাইনে চাইছে সাত হাজার টাকা। ঠিক আছে, সাত হাজার টাকা সুমিত ক্যান অ্যাফোর্ড, কিন্তু সাত হাজার টাকা কি মার্কেট রেটের চেয়ে বেশি নয়? তার ওপর বাইশ বছর বয়স, ম্যাচো এবং হ্যান্ডসাম...

রবিনবাবুর রেটও সাত হাজার। তবে রবিনবাবুর প্লাস পয়েন্ট হল, তাঁর বয়স পঞ্চাশ এবং চেহারা খেঁকুরে। এক্সপিরিয়েন্স বেশি, সাবধানি এবং অবশ্যই যে-কোনও পঞ্চদশীর পক্ষে একশো ভাগ নিরাপদ। কিন্তু রুমির রবিনকে পছন্দ নয়। কারণ রবিনবাবুর নাক খোঁটার অভ্যেস আছে। ওই হাতেই তিনি স্টিয়ারিং ধরবেন মনে হলেই রুমি ঘেন্নায় মরে যায়। সুতরাং রবিনবাবু একরকম বাতিলের খাতেই ধরা আছেন। আর এই জোয়ার নামক ছোকরাকে পাঠিয়েছে

রুমির ভাই এবং সুমিতের ছোট শালা গোপাল। গোপাল যদি বলে এক গেলাস কেরোসিন খেলে সর্দি সেরে যাবে, তাহলে রুমি বিনা দ্বিধায় হাসি-হাসি মুখে কেরোসিন খেয়ে নেবে। ছোট ভাই গোপালের প্রতি এই প্রশ্নহীন নির্ভরতা যে অতীব বিপজ্জনক, তা বহুবার রুমিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে সুমিত। বলা বাহুল্য, অন্যান্য চেষ্টার মতোই সেটিও ব্যর্থ হয়েছে।

ওই জোয়ার নামটাও ভারী সন্দেহজনক।

এ দেশে যারা মোটরগাড়ি চালাতে শেখে তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট দুটো ভাগ আছে। একদল শেখে নিজের গাড়ি চালাবে বলে, অন্যদল পরের গাড়ি। এই দুটো দলের মধ্যে স্ট্যাটাসে বিশাল পার্থক্য। যারা পরের গাড়ি চালায় তারা ড্রাইভার মাত্র। আর কিছু নয়। তাদের কারও নাম জোয়ার হলে একটু ধাক্কা লাগে বই কী! যে-কোনও পঞ্চদশীর বাবাকে জিজ্ঞেস করুন। সবাই বলবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জোয়ার একজন রেকলেস প্যাশনেট প্রেমিকের নাম বলেই সন্দেহ হয়।

ঠিক যে যে কারণে জোয়ার নামক ছোকরাটিকে সুমিতের পছন্দ নয়, ঠিক সেই সেই কারণেই রুমির ওকে পছন্দ। কেমন স্মার্ট প্রেজেন্টেবল চেহারা, কেমন ফিটফাট, আর কেমন ক্লিন হ্যাবিটস। কখনও নাকে বা কানে হাত দেয় না আর নামটাও কী ভাল! যেন কবির নাম। কোনও মানে হয়? সুমিত জানে, রুমির বাস্তববুদ্ধি বলতে কিছু নেই, কাণ্ডজ্ঞান কাকে বলে তাই জানে না, দূরদর্শিতার একান্তই অভাব। এই নতুন কেনা তাদের দ্বিতীয় গাড়িখানা নিয়েই সুমিতের পঞ্চদশী ফুটফুটে মেয়ে মিমি স্কুলে যাবে, নাচের ক্লাসে যাবে এবং মাঝেমধ্যে বান্ধবীর জন্মদিনের পার্টিতে। এবং সম্ভবত ফিরতে লেট নাইট করবে। ভাবতেই যে বুক কাঁপছে সুমিতের!

কিন্তু কী করার আছে তা-ও বুঝতে পারছে না সুমিত। এমনিতেই সে স্ট্রেসের রুগি, নানা দুশ্চিন্তায় কণ্টকিত। তার ওপর আবার আর এক দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগের জন্ম হল।

আশ্চর্যের বিষয় হল, আজ থেকে দশ-পনেরো বছর আগেও সে অনেক প্রগতিশীল উদারহৃদয় এবং পারমিসিভ ছিল। এবং যথেষ্ট গরিবও ছিল। যৌবনকালটার একটা বড় সময় তার কেটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে টিউশনি, পার্টটাইম অ্যাকাউন্ট্যান্সি এবং কলেজ স্ট্রিটের পাবলিশারের পাঠ্যবইয়ের প্রুফরিডারের কাজ করে। স্ট্যাটাস চুলোয় যাক, কোনওক্রমে বর্তে থাকাটাই ছিল যথেষ্ট। তখনকার সে এখনকার এই জোয়ারের সঙ্গেও তুলনীয় নয়।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সুমিত বলল, ঠিক আছে, গাড়িটা গ্যারাজ করে দাও।

ওকে স্যার। মিসেস বলছিলেন আপনার হয়ে গেলে উনি একটু গড়িয়াহাটে যাবেন।

ভ্রু কুঁচকে সুমিত যেন 'গড়িয়াহাট' কথাটার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করল। এবং বুঝতে পারল না। এরকম আকস্মিক একটা অন্যমনস্কতা আছে সুমিতের। হঠাৎ হঠাৎ সে ঘটমান বর্তমান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কয়েক সেকেন্ডের জন্যই বোধহয়। কিন্তু ওই কয়েক সেকেন্ডে কী ঘটেছিল তা আর সে পরে মনে করতে পারে না।

লিফটে চারতলায় নিজের ফ্ল্যাটে উঠে এল সুমিত।

ঢুকতেই তার চমৎকার দিঘল ডাইনিং কাম ড্রয়িং ঘরখানা। হলঘরখানাই এগিয়ে গিয়ে বারান্দা হয়ে গেছে। বাঁ দিকে সোফাসেট সাজানো। ওই সোফাসেটের একখানা সিঙ্গল সোফা বারান্দার খুব কাছ ঘেঁষে। ওইটিতে বসে তার বাবা রজতশুভ্র সকালে দু'-দুটো ইংরিজি আর বাংলা পত্রিকা আদ্যোপান্ত পড়তেন। ওইখানে বসলে ঝলমলে আলো আর দক্ষিণের বাতাস পাওয়া যায়। বারান্দাটা বাবার বাঁ দিকে থাকত। খুব পছন্দের ছিল তাঁর জায়গাটা। অনেকক্ষণ বসে থাকতেন। বেশ বেলা অবধি। না, টানা নয়। সকালে মিমিকে স্কুলবাসে তুলে দিয়ে আসা, বাজার-দোকান যাওয়া এসবও করতে হত। কিন্তু সুমিত

জানে, গোটা ফ্ল্যাটের এই নির্দিষ্ট জায়গাটাই বাবার সবচেয়ে প্রিয় ছিল।

জায়গাটা এখন ফাঁকা। গত এক বছর ধরেই ফাঁকা। এবং দিনে যতবার বাইরে থেকে ঘরে আসে সুমিত, ততবার হলঘরে ঢুকেই অবধারিত ওই সোফাটার দিকে তাকাবেই এবং কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকবেই। লোকটা কি আর একবারও ওই সোফাটায় এসে বসবে না? কোনওদিনই না? আগে বুকটা ধক করে উঠত। আজকাল বুকে মৃদু একটু খাঁ খাঁ।

এক বছর আগে এক ভোরবেলা রজতশুভ্র নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে সুমিত একটা বড় সাদা তোয়ালে দিয়ে সোফাটা ঢেকে বাবার একটা বাঁধানো ফোটো বসিয়ে দিয়েছিল। যাতে কেউ আর সোফাটায় বসতে না পারে। প্রথম কিছুদিন রুমি কিছু বলেনি, তারপর বলল, এটা ভারী অড দেখাচ্ছে কিন্তু।

সুমিত সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠে বলেছিল, কেন?

অ্যাজ় ইফ হি ইজ় ডেড।

এই কথাটা মনে হয়নি সুমিতের। ঠিকই তো। এইভাবে ফোটো সাজিয়ে রাখলে তার একটা আলাদা মানেও করে নিতে পারে লোক। এখন তোয়ালে, ছবি কিছুই নেই। তবু ওই সোফাটা যেন অন্য সব সোফার চেয়ে একটু আলাদা গাম্ভীর্য নিয়ে থাকে। গাম্ভীর্য! কিংবা বিষাদ!

তিন বেডরুমের এই ফ্ল্যাটে একটা ঘর বাবাকে দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমের সবচেয়ে ছোট ঘরখানাই বাবা পছন্দ করতেন। যেন বা ধরেই নিয়েছিলেন ফ্ল্যাটের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘরখানাই তাঁর প্রাপ্য হওয়া উচিত। ওই ঘরে বাবার বিছানা আজও পাতা আছে। বাবার হাওয়াই চটিজোড়া মেঝেতে সাজানো পাপোশের ওপর। আলনায় এখনও রজতশুভ্রর কাচা লুঙ্গি, গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার সযত্নে ভাঁজ করে রাখা। বালিশের পাশে টর্চ, মোবাইল ফোন।

ঘরে-দোরে রান্নার গন্ধ ছড়িয়ে পড়াটা একদম পছন্দ করে না সুমিত। সেইজন্য সে রান্নাঘরে চিমনি ছাড়াও একটা বড় একজস্ট ফ্যান লাগিয়ে দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে একটা কাচের দরজাও। তবু ঘরে ঢুকেই সে মাংস রান্নার তীব্র গন্ধটা পেল। তার অল্প বয়সে মা যখন মাংস, চিংড়ি বা ইলিশ রান্না করত, তখন সেই গন্ধ পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে পড়ত। আর সেই বয়সে ওই মাদক গন্ধে উন্মন হয়ে তাড়াতাড়ি খিদেও পেয়ে যেত। এখন ব্যাপারটা তার পছন্দ হয় না। রাঁধুনিটা নতুন। প্যাসেজে ঢুকে উঁকি দিয়ে দেখল, রান্নাঘরের স্লাইডিং দরজাটা খোলা। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সি রাঁধুনি মেয়েটার কানে হেডফোন। বোধহয় মোবাইলে এফ এম শুনছে আর মন দিয়ে ছুরিতে কাটিংবোর্ডে ধনেপাতা কুচি করছে। দরজায় টোকা দিতেই তাকাল। আগে লক্ষ করেনি, মেয়েটার মুখখানা দারুণ সুন্দর। রোগা এবং সাদা রং। জামাকাপড়ও রীতিমতো ফিটফাট পরিষ্কার। অ্যাপ্রনও পরে নিয়েছে।

ইশারায় দরজাটা বন্ধ করতে বলে সরে এল সুমিত। এ আর এক দুশ্চিন্তা। কাজের মেয়েদের অ্যাট্রাকটিভ চেহারা হলে নানা প্রবলেম হয়।

সুমিত জীবনে কখনও সিগারেট খায়নি। কিন্তু রজতশুভ্র খেতেন। খুব সস্তা ব্র্যান্ডই কিনতেন। এক বছর আগেও ঘরে ঢুকলেই সিগারেটের গন্ধটা পাওয়া যেত। সেন্টার টেবিলের ওপর তখন একটা বড়সড় অ্যাশট্রে থাকত। এখন সিগারেটের বিন্দুমাত্র গন্ধ ফ্ল্যাটটার কোথাও পাওয়া যায় না। অ্যাশট্রেটাও উধাও হয়েছে।

বাবার সোফাটার মুখোমুখি অন্য সিঙ্গল সোফায় বসে সুমিত চুপ করে চেয়ে ছিল। সেন্টার টেবিলের ওপর আজকের টাটকা দুটো খবরের কাগজ পড়ে আছে, কেউ পাতা উলটেও দেখেনি। সুমিতের খবরের প্রতি আকর্ষণ নেই। খবর পড়ে কী হবে? তেমন কোনও বড় ঘটনা ঘটলে টিভির অজস্র নিউজ় চ্যানেল মারফত ঘরে ঘরে পৌঁছে

যায়। কোনও খবরই কারও অবিদিত থাকে না। বাবা ছাড়া এ বাড়িতে সুতরাং খবরের কাগজ পড়ার কেউ নেই। তবু খবরের কাগজ নেওয়া বন্ধ করতে কিছুতেই ইচ্ছে হয়নি সুমিতের। দুটো খবরের কাগজ এখনও নিয়মিত আসে, পড়ে থাকে, তারপর বাসি হয়ে স্ট্যাকে চলে যায়।

রুমি ঘরে পা দেওয়ার আগেই এল তার সুগন্ধ। রূপটান, স্প্রে, সানস্ক্রিন কত কী যে মাখে রুমি! সাজতে বড্ড ভালবাসে। কিন্তু রুমি সুন্দরী নয়। তার মুখ চৌকো, কর্কশ, লাবণ্যহীন। গালে পুরনো ব্রণর দাগ আছে। চোখ কোটরগত। তাতে মেধা থাকলেও মোহময়তা নেই। বিয়ের ষোলো-সতেরো বছর পর স্ত্রীর সৌন্দর্য বা সৌন্দর্যহীনতা নিয়ে পুরুষের বড় একটা মাথাব্যথা থাকে না। সুমিতেরও নেই। আর সে নিজেও তো কিছু কন্দর্পকান্তি নয়। তবে একসময়ে নিয়মিত জিম করত বলে তার স্বাস্থ্যটা ভাল। এখন করে না।

তুমি কি বেরোবে?

রুমির পোশাকটা নিস্পৃহ চোখে দেখল সুমিত। খুবই সুন্দর পোশাক। ঝলমলে সোনালি রঙের ঘাগরা আর গাঢ় নীলের ওপর সবুজ এবং লাল ফুলকারি করা চোলি। ঢলঢলে চেহারা হলে পোশাকটা ভারী মানিয়ে যেত। এত কাঠ-কাঠ চেহারায় ততটা মানাচ্ছে না।

ভাবছি।

আমি কিন্তু বেডরুম লক করে দিয়েছি। তোমার কোনও দরকার নেই তো?

না।

চাবি নিয়ে বেরোতে ভুলো না। মেয়েটা বেলা একটায় চলে যাবে।

ঠিক আছে।

আমি মিমিকে গানের স্কুল থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে। তুমি খেয়ে নিয়ো।

হুঁ।

রুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর কোনও শূন্যতা সৃষ্টি হল না ফ্ল্যাটে। শূন্যতাটা আসলে আছে। একটু একটু বাড়ছে কি?

রজতশুভ্রর ডেডবডি পাওয়া যায়নি। কোনও আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুর বাড়িতেও যাননি। কোথায় গেলেন এই প্রশ্নটা ক্রমে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। কিন্তু কোথাও আছেন এবং বেঁচেবর্তে আছেন, এই পলকা সুতোর মতো একটা বিশ্বাস আজও ছিন্ন হয়নি। রজতশুভ্রর একটা তিন লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট আছে, যার নমিনি মিমি। আর নাতনির সঙ্গে একটা জয়েন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট। তাতে সত্তর হাজারের কিছু বেশি টাকা আছে। কোথাও যেতে হলে বা অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করতে হলে রজতশুভ্রর নিশ্চয়ই টাকার দরকার। সুমিতের এমন বিশ্বাস ছিল, তার বাবা নিশ্চয়ই নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলেছেন। কিন্তু ভয়ে সে ব্যাঙ্কে গিয়ে খবরটা নিতে পারেনি। যদি টাকা না তুলে থাকেন? তাহলে? সেই খারাপ খবরটা জানতে চায়নি সুমিত। শুধু নিজেকে প্রবোধ দিয়েছে, নিশ্চয়ই বাবা টাকা তুলেছে। নিশ্চয়ই...

ওই বিশ্বাসটার একটা জোর ছিল। তবে তেমন জোরালো নয়। নিজেকে ভুলিয়ে রাখা যেত আর কী। কিন্তু তাতেও এক ঘটি জল ঢেলে দিল একদিন মিমি। শিশুকাল থেকেই মিমির বিশ্বাস, দাদুর সব কিছুই তার। দাদু তার কখনও পুতুল, কখনও সহ-খেলুড়ে, কখনও মা, কখনও বাবা এবং বন্ধু। কতদিন দাদুর সঙ্গেই গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে রাতে। দাদুর সঙ্গে একপাতে বসে খেতে খুব ভালবাসত। বায়নাও ছিল সব দাদুর কাছেই।

রজতশুভ্র নিরুদ্দেশ হওয়ার পর মিমি কিছুদিনের জন্য একদম পাগল হয়ে গিয়েছিল। ঘুমের ভেতরেও কেঁদে উঠত। খেতে পারত না। সাজগোজ করতে চাইত না, স্কুল কামাই করত। ডোরবেল বাজলেই পড়ি কি মরি করে ছুটে যেত। কারও মোবাইল ফোন বাজলেই হামলে

গিয়ে পড়ত। মাস দুই বাদে সে একদিন থমথমে মুখে ঘরে ঢুকে বলল, দাদুর পাশবই আপডেট করাতে ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। দাদু টাকা তোলেনি।

তারপর সে কী কান্না! বোধহয় মিমিও টাকা না তোলার গভীর এবং ভয়ংকর কারণটা অনুমান করেছিল।

খুব একটা ঝটকা টান লাগল বটে, কিন্তু তবু সুতোটা ছিঁড়ল না। ওই যে বিশ্বাসের পলকা সুতোটা! কোথাও আছেন, হয়তো বেঁচেবর্তেই আছেন।

কিন্তু ধরা যাক, হার্ট অ্যাটাক বা সেরিব্রালে যদি মারাই যেতেন রজতশুভ্র, তাহলে শোক-টোক হত বটে, কিন্তু সেসব এতদিনে কেটে গিয়ে সব স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারত, যেমনটা হয়ে থাকে আর কী। সংসারের নিয়ম। জীবন অনিত্য, কে না জানে? কিন্তু এই নিরুদ্দেশ হওয়াটা মৃত্যুর চেয়ে বহু বহু গুণ ভয়ংকর। বুকের ভেতরে যেন একটা ঢেঁকিকল। উঠছে, নামছে। বেঁচে আছেন? মারা গেছেন? রজতশুভ্র একটা স্থায়ী টেনশন রেখে গেছেন।

প্যান্টের পকেটে মোবাইলটা বেজে উঠল। গত এক বছর যতবার মোবাইল বাজে ততবার তার বুক ধক করে ওঠে, এখনও।

সুমিত বলছি।

স্যার, আমি বৈদূর্য। কুচবিহার থেকে বলছি।

কী খবর বৈদূর্য?

খবর ভাল নয় স্যার। পরিতোষবাবু খুব তিরিক্ষি মেজাজের লোক।

আগে তো ছিলেন না।

এখন হয়েছেন। আপনার বাবার নাম শুনেই খচে গেলেন।

কেন?

উনি নাকি দু'বছরের ভাড়া না দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। বিশ বছর আগের ঘটনা উনি আজও মনে করে বসে আছেন।

কত টাকা বাকি ছিল সেটা জেনে নিয়ে আমাকে বোলো। টাকাটা পাঠিয়ে দেব।

দেবেন স্যার? অত পুরনো দেনা কি আর ভ্যালিড থাকে? তামাদি হয়ে যাওয়ার কথা।

তামাদি হওয়ার প্রশ্নই নেই। টাকার অ্যামাউন্টটা জেনে নাও।

ঠিক আছে স্যার। বিশ বছর আগেকার ভাড়ার রেট আর কতই বা হবে। তার ওপর কুচবিহারের মতো জায়গায়। তারও ওপর টিনের ঘর এবং ল্যাট্রিন বেশ দূরে। জলের জন্য পাতকুয়োর ব্যবস্থা। না স্যার, ভাড়া মেরেকেটে...

ওটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না বৈদূর্য, বাবার কোনও খবর পেলে?

পরিতোষবাবুর কাছে কোনও খবর নেই।

সেটা স্বাভাবিক, ও বাড়িতে বাবার যাওয়ার কথাও নয়। তবে আমরা কুচবিহারে অনেকদিন ছিলাম। অন্তত বছর ছয়েক। বাবার খুব প্রিয় জায়গা। অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল। আমার এক পিসির বাড়িও ওখানে।

হ্যাঁ স্যার, সব খোঁজ-খবরই করব। কাল সকাল থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছি। ইন ফ্যাক্ট, পরিতোষবাবু আমাকে খুব হেলপ করছেন।

পরিতোষবাবু! এই যে বললে আমাদের ওপর খেপে আছেন!

না স্যার, আপনার ওপর কোনও রাগ নেই। ওঁর রাগ রজতবাবুর ওপর। ওরা দু'জন ব্রিজ খেলার পার্টনার ছিলেন। আর ভুল খেলার জন্য রজতবাবু নাকি প্রায়ই পরিতোষবাবুকে খুব বকাঝকা করতেন। এমনকী হাতাহাতিরও উপক্রম হত। সেই খারটা এখনও পরিতোষবাবুর খানিকটা আছে।

ওঁরা ব্রিজের পার্টনার ছিলেন, এ কথা ঠিক। ঝগড়া হত, আবার গলায় গলায় ভাবও ছিল।

আপনি নীলাকে বিয়ে করলেন না কেন স্যার?

প্রথমে অবাক তারপর বিরক্ত হয়ে সুমিত বলে, সে কথায় তোমার

কাজ কী? নীলার কথা কে বলেছে তোমাকে?

কিছু মনে করবেন না স্যার, নীলাকে বিয়ে করলে বকেয়া ভাড়ার টাকার কথাও উঠত না। পরিতোষবাবুর সেইজন্যই তো রাগ। রজতবাবু নাকি ওঁকে কথা দিয়েছিলেন যে, নীলার সঙ্গে আপনার বিয়ে দেবেন!

কী আশ্চর্য! তুমি কুচবিহারে গেছ একটা ইনভেস্টিগেশনে। আমার ওপর রিসার্চ করতে তো নয়!

সরি স্যার। আসলে আমি পরিতোষবাবুর বাড়িতেই আছি কিনা, তাই পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথা এসে পড়ে।

স্তম্ভিত সুমিত বলে, পরিতোষবাবুর বাড়িতে আছ! তুমি আমাকে অবাক করলে! কোন সুবাদে তুমি ওঁর বাড়িতে উঠেছ?

মফস্‌সলের লোকেদের মধ্যে পুরনো ভ্যালুজ় এখনও একটু আছে স্যার। তারা কলকাতার লোকেদের মতো সেয়ানা নয়। আপনার কাছ থেকে এসেছি শুনে উনি নিজেই আমাকে ওঁর বাড়িতে থাকার প্রস্তাব দেন। বেশ বড় বাড়ি স্যার। বেশির ভাগটাই তো ফাঁকা পড়ে আছে। আর আমিও আপত্তি করিনি স্যার। হোটেলে থাকার পয়সাটা তো বাঁচল! রাহা খরচ আর পকেটমানি কী পাই সে তো আপনি জানেন। আমি তো ব্যোমকেশ বা কিরীটি রায় নই। নিতান্তই একটা ছোট ডিটেকটিভ এজেন্সির একজন অপারেটর। আপনি খরচের কিছু টাকা দিয়েছিলেন স্যার। টাকাটা বাঁচালাম। ফালতু খরচ করে লাভ কী?

সুমিত তেতো গলায় বলল, ওঁদের বাড়িতে ওঠা তোমার উচিত হয়নি বৈদূর্য।

কথাটা গায়ে মাখল না বৈদূর্য। বলল, অনেকদিন বাদে স্যার চালকুমড়োর পুরভাজা খেলাম আর নদীয়াল মাছ। আর জলপাই আলু দিয়ে মানকচুর তরকারি। জীবনে এত ভাল জিনিস খাইনি কখনও। মাসিমা দারুণ রাঁধেন।

সেটা খুব জানে সুমিত। উত্তমী মাসিমার রান্না তো সে কম খায়নি।

কিন্তু সেসব বড়লোকি ব্যাপার নয়। নিতান্তই কচুর শাক, কচু বাটা, কুমড়ো পাতায় মোড়া মাছের পাতুরি, লাউ বা চালকুমড়োর খোসা দিয়ে তরকারি বা বড়ির ঝাল। দুই পরিবারে তখন দারুণ ভাব। এতটাই যে, এ পরিবার যেন ওই পরিবারে ঢুকে গেছে এবং একাকার। সুমিতের বয়স তখন আঠেরো বা তারও কম। নীলা তেরো-চোদ্দো। তবু হবু জামাই বলে সুমিতের কত খাতির ছিল ওদের কাছে। মার-মার করে শত্রুসৈন্যের মতো পুরনো স্মৃতি তেড়ে আসছে সুমিতের দিকে। দম বন্ধ হয়ে আসে সুমিতের। সে তাড়াতাড়ি বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে বৈদূর্য! ওদের ওপর বেশি উৎপাত কোরো না।

একটা কথা স্যার।

কী কথা?

আপনি নাকি দারুণ সাইকেলবাজ ছিলেন! প্রতি বছর সাগরদিঘির চারপাশে যে-সাইকেল রেস হত তাতে নাকি আপনি বরাবর ফার্স্ট হতেন!

তাতে কী হল বৈদূর্য? এইসব ইনফরমেশন তোমার কোন কাজে লাগবে?

না স্যার, নীলাদিদি বলছিলেন কিনা!

নীলা! তাকে তুমি কোথায় পেলে?

কেন স্যার, উনি তো ছেলেকে নিয়ে এখন এখানেই থাকেন!

কিন্তু ওর তো আমেদাবাদে—

হ্যাঁ স্যার। আমেদাবাদেই ছিলেন। তবে উনি একজন পাইলটকে বিয়ে করেছিলেন। আর জানেনই তো স্যার, পাইলটকে বিয়ে করা খুব রিস্কি।

তার মানে কী বৈদূর্য? ইজ় আদিত্য ডেড?

আমার কী মনে হয় জানেন স্যার? আমার মনে হয় নীলাদিদিকে আপনারই বিয়ে করা উচিত ছিল। এমন পটেশ্বরীর মতো চেহারা,

আর এমন মায়াবী মানুষ কোথায় পাবেন স্যার? আপনাদের বিয়ে হলে এই স্যাড ব্যাপারটা ঘটতে পারত না।

ধৈর্য হারিয়ে সুমিত একটা ধমক দিল।— ইডিয়টের মতো কথা বোলো না তো বৈদূর্য! মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

সরি স্যার। আসলে আমার একটু আবেগ এসে গিয়েছিল। আর কোথাও কারও কাছে এমন আদর-যত্ন পাইনি তো। পরস্য পরকে যে এত লাই দেওয়া যায় তা বিশ্বাস হয় না।

তুমি বরং ফিরে এসো বৈদূর্য। আমার মনে হচ্ছে কুচবিহারে বাবার কোনও হদিশ পাওয়া যাবে না।

না স্যার। কুচবিহারে নয়। তবে ময়নাগুড়িতে।

ময়নাগুড়িতে! তার মানে কী?

আমার ফোনের চার্জ ফুরিয়ে এসেছে স্যার। এক্ষুনি লাইন কেটে যাবে। সস্তা ফোন তো, পুরনোও হয়েছে। পরে কল করব স্যার।

বৈদূর্য বুদ্ধিমান না গাড়ল না পাগল এটা গত দু'মাসেও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না সুমিত। তবে কালীপ্রসাদ বৈদূর্যকে স্নেহ করেন। তিনি একাধিকবার সুমিতকে বলেছেন, ওর টেনাসিটি আছে বুঝলেন। কোনও কেস দিলে লেগে থাকতে পারে। দু'-চারবার মারধর খেয়েছে, বার তিনেক পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তবু কিন্তু দমবার পাত্র নয়।

কালীপ্রসাদ নিজে লালবাজারের ভারিক্কি গোয়েন্দা অফিসার ছিলেন। রিটায়ার করার পর ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। রজতশুভ্রর অনুসন্ধানে পুলিশ প্রথমে তৎপর ছিল। ক্রমে তারা এখন ঢিলে দিয়েছে। এবং সেটাই স্বাভাবিক। তাদের তো একটা কেস নয়। দু'মাস আগে সুমিত তাই কালীপ্রসাদের এজেন্সি সন্ধানীকে কাজে লাগিয়েছে।

ওই আহাম্মক বৈদূর্যটার জন্যই আজ আবার পুরনো রক্তক্ষরণ টের পাচ্ছে সুমিত। কুচবিহার, সাইকেল, নীলা সব যেন চোরাস্রোতে স্মৃতির ডুবজলে নিয়ে গিয়ে দমবন্ধ করে দিচ্ছে তার।

ভারী মিষ্টি সুরেলা গলায় কে যেন বলল, আপনাকে এক কাপ কফি করে দিই দাদা?

বোজা চোখ খুলেই ফের সেই অস্বস্তি। কাজের মেয়ের এতটাই ভাল চেহারা হওয়ার কি কোনও দরকার ছিল? শরীরটা একটু রোগাটে এবং বেশ ফর্সা, তাতে পরনের মেরুনরঙা শাড়িটা মানিয়েছেও ভারী ভাল। কিন্তু অবিশ্বাস্য এর মুখশ্রী। বড় বড় চোখ, ছোট কপাল। পুরন্ত ঠোঁট, মসৃণ গাল সব মিলিয়ে জাহাজ ডোবাতে পারে। ফ্ল্যাটে এখন সে আর এই মেয়েটি। ভাবলেই অস্বস্তি হয় সুমিতের। মেয়েটা কিন্তু খুব সহজ।

সুমিত তার পাপী চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, না, আমি এখন একটু বেরোব।

বেরোবেন? দুপুরে খাবেন না? সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে তো!

ছুটির দিনগুলো ছাড়া সুমিত লাঞ্চ বড় একটা করে না। সকালে সামান্য জলখাবার খেয়ে কাজে বেরিয়ে যায়। লাঞ্চ তার কাছে জরুরি ব্যাপারও নয়। সে মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, তোমার নামটা যেন কী!

মেয়েটা বিচ্ছুর মতো একটু হেসে বলল, সুমিতা। সুমিতা সরকার।

সুমিত ভ্রু কোঁচকাল। তার সঙ্গে নামের মিলটা হয়তো আকস্মিক, কিন্তু ব্যাপারটা তার একটুও পছন্দ হল না। আর সুমিতার ওই হাসিটাও। যেন বা হাসিতে একটু ইশারা-ইঙ্গিত আছে।

আপনি আমার দাদাকে চেনেন।

কে বলো তো!

তারক বিশ্বাস। ইলেকট্রিশিয়ান। আপনিই তাকে ইলেকট্রিকের কাজ শিখিয়েছিলেন। মনে আছে? যখন আপনারা রহিম ওস্তাগর রোডে থাকতেন!

মনে আছে সুমিতের। পাশের বস্তির অনেকগুলো বেকার ছেলে ষণ্ডামি-গুলতানি করে বেড়াত, মদ গাঁজা খেত। তাদের হিল্লে করে দেওয়ার জন্য সে ধরে ধরে এনে পাঁচ-ছয়জনকে কাজ শিখিয়েছিল। মিস্ত্রিরা কখনও বসে থাকে না। কলের মিস্ত্রি বা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি যাই হোক, কাজ করে পেট চালিয়ে নিতে পারবে। সে যতদূর জানে, তারকের বেশ পসার হয়েছিল। এখন আর খবর রাখে না।

হ্যাঁ, তারককে মনে আছে। কী করছে এখন?

মেয়েটার মুখটা একটু আঁশটে হয়ে গেল। বলল, রোজগার তো খারাপ নয় দাদা। কিন্তু মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে সব উড়িয়ে দেয় যে।

হুঁ। সুমিত জানে, ওইটেই এদের মুশকিল। রোজগারের সঙ্গে মদ খাওয়া একেবারে পিঠোপিঠি চলে আসে।

আমার বিয়ের সময় আপনি চার হাজার টাকা দিয়েছিলেন, মনে আছে?

সুমিত একটু উদাস হয়ে বলল, তা হবে। মনে নেই।

দিয়েছিলেন। কিন্তু কী হল বলুন? বিয়েটাই তো টিকল না।

তাই নাকি?

কী করে টিকবে বলুন? মানিক তো দাদারই বন্ধু। সবাই জানে যে, আমাদের নাকি লাভ ম্যারেজ। একটুও সত্যি কথা নয়। ওই আমার পেছনে লাগত, জ্বালাতন করত, ফোন করত। শেষে দাদাই জোরাজুরি করে বিয়ে দিয়ে দিল। আমার বয়স তখন ষোলো-সতেরো। প্রথম প্রথম ভালই ছিল। পরে মদ খাওয়া বাড়ল, গায়ে হাত তুলত। ডাকাতি করতে গিয়ে দু'বার ফেঁসে গিয়েছিল। শেষবার তিন বছর জেল খাটে। ওই লোকের সঙ্গে কি ঘর করা যায়?

ডিভোর্স হয়ে গেছে?— প্রশ্নটা করেই নিজের ভুল বুঝতে পারল সুমিত। ওদের বিয়ের বেশির ভাগই নমো নমো করে, না হয়তো কালীঘাটে। ডিভোর্সের বালাই নেই। যখন ইচ্ছে ছেড়ে গেলেই হল।

মেয়েটা ম্লান একটু হেসে বলল, আইন-আদালত তো হয়নি। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। শুনেছি আমাকে খুন করবে বলে পকেটে পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াত।

সর্বনাশ! কী করলে তখন?

সোনারপুরে এক মাসির কাছে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর নিজেই কাজকর্ম করতে শুরু করি।

চোখে দুশ্চিন্তা নিয়ে মেয়েটার দিকে একটু চেয়ে রইল সুমিত, মেয়েটা দেখতে ভাল। রীতিমতো ভাল। মানিক কত বড় মস্তান বা কতটা মরিয়া তা সে জানে না। কিন্তু ভাগলপুরের ওয়ান শটার একটি সুলভ বস্তু এবং এখন পকেটে পকেটে ঘোরে। সেই সুবাদে ঢোঁড়াও আজকাল গোখরো হয়ে ওঠে। মানিক যদি একজন ভ্যালুজ়হীন, জানকবুল পুরুষ হয়ে থাকে তাহলে সে খুঁজে খুঁজে গন্ধে গন্ধে একদিন এই ফ্ল্যাটে এসে হাজির হবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাহলে কী হবে? জ্যান্ত মেয়েটার দিকে চেয়ে মনশ্চক্ষে তার রক্তাক্ত লাশটাও যেন দেখতে পেল সুমিত। ওই তো বাইরের দরজার কাছে ওয়েলকাম লেখা পাপোশটার ওপর পড়ে আছে। মর্মরের মেঝেয় আপনা থেকেই আলপনা রচিত হচ্ছে তার রক্তে। দারিদ্র্যসীমার খুব কাছাকাছি যারা অবস্থান করে, সেই যুবশক্তি হিরোইজ়মের প্রতি আসক্ত। তবে তারা ক্ষুদিরাম বা সুভাষ বোস হতে চায় না। তাদের হিরো হল মহতো মহীয়ান অমিতাভ বচ্চন, সলমন খান বা শাহরুখ। আর বদলা নেওয়াই যে জীবনের আসল উদ্দেশ্য, এটা তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে। তাই তারা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনাহীন। চারপাশটার প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং তরলমতি। তাদের কাছে আজকের দিনটাই 'সত্য', কাল বা পরশু বলে কিছু নেই।

সুতরাং এই সুন্দরী মেয়েটির ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু উদ্বেগ বোধ করে সুমিত। যদি মানিক একদিন সত্যিই একে ফুঁড়ে দেয়, তাহলে এর এই সৌন্দর্যের একটা নিদারুণ অপচয় ঘটবে না কি!

আপনি ঘুরে আসুন দাদা। আমি আছি।

সুমিত বলল, আরে না, আমার জন্য তোমাকে বসে থাকতে হবে না।

সেজন্য নয়। আমাকে যে নিতে আসে তার আজ আসতে একটু দেরি হবে। তাই একটু দেরিতে যাব।

সুমিত অবাক হয়ে বলে, নিতে আসবে? তোমার কি চলনদার দরকার হয়?

হ্যাঁ। আমি বড্ড ভিতু মেয়ে। আর রাজুও আমাকে একলা ছাড়তে চায় না। সকালে যখন কাজে বেরোই তখন খুব ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ি বলে ততটা ভয় করে না। কিন্তু বেলার দিকে ভয়-ভয় করে।

রাজু কে?

সুমিতা চোখটা নামিয়ে নিল চট করে। একটু লাজুক হাসি হেসে বলল, ও একটা ছেলে দাদা। ভাল ছেলে। বি কম পাশ।

কারও কারও কাছে বি কম পাশটাই যে ভালত্বের লক্ষণ, সেটা সুমিত ভালই জানে। সে বেশ কিছুদিন বস্তিবাসীদের খুব কাছ ঘেঁষে বাস করেছে।

মানিক কি এখনও তোমার পিছু ছাড়েনি?

না দাদা। আমার দাদার কাছ থেকে খবর নেওয়ার চেষ্টা করে। দু'জনে এক গ্লাসের ইয়ার তো, দাদাও সব খবর ওকে দেয়। তাই আমি আজকাল দাদার সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না।

দুই

তখন আয়ুষ্মানের মাত্র দশ বছর বয়স, আর টুকুসের ছয়। তখন দুপুরবেলা। রঙিন কাগজ, গদের আটা, বাঁশের কাঠি, কাঁচি, মাপের স্কেল ছড়িয়ে নিয়ে মেঝের ওপর বসে মন দিয়ে ঘুড়ি তৈরি করছিল আয়ুষ্মান। একটা-দুটো তো নয়, একশো-দেড়শো ঘুড়ির অর্ডার থাকত সে সময়ে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাজ না করলে সময়মতো দেওয়া যাবে না। আর ওইটেই তাদের তখন সবচেয়ে বড় রোজগার ছিল। টুকুসের বয়স তখন ছয়। বেশি কিছু পারত না সে, তবে খাপ পেতে পাশেই বসে থাকত মেঝেয়। দরকারে এটা-ওটা এগিয়ে দিত। মুখখানায় হাসিখুশি ভাব ছিল না কখনও টুকুসের। সর্বদা দুঃখী-দুঃখী ভাব, রং কালো মতো, রোগা। শুধু দু'খানা ড্যাবা ড্যাবা ভাসন্ত চোখ। ঠান্ডা স্বভাবের বলে বরাবর টুকুসের ওপর বড্ড মায়া আয়ুষ্মানের। সে অত হার্মাদ, কিন্তু এই বোনটা ঠিক তার উলটো। দুষ্টুমি নেই, কান্নাকাটি নেই, নালিশ নেই, বায়না নেই। এমনকী মা মাঝে মাঝে অকারণেই যখন চুলের মুঠি ধরে গুমগুম করে কিলোত তখনও চেঁচাত না। চুপচাপ ঘরের কোনও কোণে গিয়ে লুকিয়ে ফিসফিস করে কাঁদত। টুকুস দুষ্টু নয়। বায়না করে না, অবাধ্য নয়, তবু মা মারত কেন? কারণটা বড় হয়ে বুঝতে পারে আয়ুষ্মান। অভাব-অনটনের সংসারে মায়ের মনে নানা কারণেই বিষ জমে উঠত। কাউকে না কিলোলে ওই বিষ বেরোবে কী করে? বেচারা টুকুস সেই দিক দিয়ে নীলকণ্ঠী। তা সেদিন দুপুরে খুব মন দিয়ে ঘুড়ি বানাচ্ছিল আয়ুষ্মান। বুলাকি স্টোর্সের গোপালদা একশো ঘুড়ির অর্ডার দিয়েছে। বান্ধব ভাণ্ডারের অর্ডার পঞ্চাশ পিসের। দম ফেলার সময় নেই। ওই দশ

বছর বয়সেই পয়সার কদর করতে শিখে গিয়েছিল সে। ঘরে একটু পয়সা এলেই ঘরে-দোরে যেন বেশি বেশি আলো আসত, হাওয়া আসত। মা খুশি, বাবা খুশি, ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি উধাও, সকলেরই হাসি-হাসি মুখ।

হঠাৎ হামাগুড়ি দিয়ে তার একটু কাছে এসে টুকুস পাখির স্বরে বলল, দাদা, তোর কিন্তু জ্বর হবে।

কথাটা প্রথমে বুঝতেই পারেনি আয়ুষ্মান। তারপর বলল, জ্বর হবে? জ্বর হবে কেন?

টুকুস ড্যাবা ড্যাবা ভিতু চোখে চেয়ে থেকে বলল, হবে তো।

যাঃ। জ্বর-টর আমার হয় না।

অবাক কাণ্ডটা হল, সেই রাতেই কিন্তু আয়ুষ্মানের প্রচণ্ড জ্বর এল। এক লাফে একশো চার। তিনদিন বাদে ধরা পড়ল টাইফয়েড। তেরো-চোদ্দো দিন ভুগে উঠেছিল আয়ুষ্মান। আর জ্বরের মধ্যেই বারবার টুকুসের কথাটা মনে পড়েছে, দাদা, তোর কিন্তু জ্বর হবে। অথচ দুপুরবেলা জ্বরের কোনও লক্ষণই তো ছিল না!

শিয়রে এসে ম্লান মুখে বসে থাকত টুকুস। আয়ুষ্মান জিজ্ঞেস করত, তুই কী করে আগেই বুঝলি যে, আমার জ্বর হবে?

টুকুস বলত, এমনিই বুঝলাম।

তখন থেকেই, টুকুসের মধ্যে একটা কিছু আছে এই ধারণাটার জন্ম হল আয়ুষ্মানের মনে। আর তখন থেকেই এই ম্লানমুখী, করুণ, রোগা আর চুপচাপ মেয়েটাকে সে একটু সমীহের চোখে দেখত।

আয়ুষ্মানের চেয়ে চার বছরের বড় তার দিদি ঝিল্লি। আর দিদি একদম টুকুসের মতো নয়, উলটো।

যেসব মেয়ের লেখাপড়ায় মন নেই, গানবাজনার নেশা নেই, সেলাই-ফোঁড়াই করে না, ছবি আঁকে না, কবিতা লেখে না, নাচ শেখে না তাদের বড্ড উড়ু-উড়ু মন হয়। ঝিল্লির বয়স যখন চোদ্দো-পনেরো, তখন বাড়িতে থাকলে বেশির ভাগ সময়েই তাকে দেখা

যেত আয়নার সামনে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে দেখছে তো দেখছেই। আর নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে সে একা একাই মুখ টিপে টিপে হাসত। চাউনি প্র্যাকটিস করত। খুব সাজত।

এ পাড়ায় অলিগলির অভাব নেই। ঝিল্লিকে প্রায়ই দেখা যেত সেইসব অলিগলিতে বিভিন্ন অচেনা ছেলে-ছোকরার সঙ্গে ফিসফিস আর হাসাহাসি করতে। সেইসব ছোকরাদের অনেকের চেহারা বেশ ভাল। পরনে ভাল পোশাক, কবজিতে দামি ঘড়ি এবং হাতে দামি মোবাইল। হয়তো তাদের কেউ কেউ বেশ টাকাওয়ালা বাপের ছেলে। কিন্তু কাউকেই খুব ভদ্র বা অভিজাত বলে মনে হত না। একটু ফান্টুস টাইপের। পেটে বিদ্যে নেই। হিন্দি সিনেমার ডায়ালগ ধার করে কথা বলে, পেয়ার-মোহব্বতের চেয়ে মহৎ কোনও কর্মও নেই তাদের।

বাবা ট্যাক্সি চালায়, সুতরাং সারাদিন বাড়িতে থাকে না। মা পাড়াতেই একটা আয়া সেন্টার চালায়। সুতরাং ঝিল্লিকে শাসনে রাখার মতো বাড়িতে কেউই নেই। তবে মায়ের কাছে খবর পৌঁছত ঠিকই। একদিন কি দু'দিন মা খেপে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে দরজার বাটাম দিয়ে খুব পেটায়। কিন্তু প্রথম প্রথম ভয় খেলেও কয়েক দিনের মধ্যেই ঝিল্লিও রুখে দাঁড়াল। মা মারতে গেলে সে উলটে মায়ের হাত মুচড়ে দিয়ে এক ধাক্কায় ফেলে দিত মেঝেয়। মা রোগাভোগা মানুষ, আর ঝিল্লি বয়সের মেয়ে, মা পারবে কেন?

আয়ুষ্মান জানত, তার বাবা রোখা-চোখা মানুষ। তারা সবাই বাবাকে খুব ভয় পেত। একটু বেশি রাতের দিকে বাড়ি ফিরে তাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার রাগী বাবা মেয়ের উদ্দেশে খুব খারাপ ক'টা গালাগাল দিয়ে প্রচণ্ড পেটাল। প্রথমে হাত দিয়ে, পরে একটা লোহার পাইপ। অমানুষিক মার। ওই মারে চরিত্র শুধরে যাওয়ারই কথা। কিন্তু দিদিও কি তখন স্বাভাবিক চেতনায় ছিল? চিৎকার করে বলছিল, খুন করে ফেলো আমাকে! খুন করে ফেলো! নইলে আমি নিজেই মরব।

বাবা হুংকার দিল, মরবি? তাই মর খানকির মেয়ে!

এক ফাঁকে বাবার হাত থেকে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে ভেতরের বারান্দায় রাখা কেরোসিনের বোতল তুলে হড়হড় করে নিজের শরীরে ঢেলে রান্নাঘর থেকে দেশলাই নিয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে যখন দেশলাই ধরাতে যাচ্ছে, তখন উত্তেজনায় ওর দুই হাত ঠকঠক করে কাঁপছিল, ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় শুধু বলছিল, মরব! মরব! মরব! মরব...

মরার জন্য সে কী খুনিয়া নেশা! দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ঠোঁটের কষে ফেনা, উন্মাদিনী দৃষ্টি, এলোচুলে এক সর্বনাশের ছায়া। বারবার ঠকঠক করে কাঁপা হাতে দেশলাই জ্বালাতে যাচ্ছে আর বারবার স্খলিত হাত থেকে কাঠি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে।

সেই সময় নিশ্চয়ই তারা সবাই কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গিয়েছিল। নইলে দিদিকে বাঁচাতে তার বাবা এক পা-ও এগোল না, মা কঠিন মুখ করে দাঁড়িয়েই রইল এবং সবচেয়ে অবাক কাণ্ড যে, তখন আয়ুষ্মানের ইচ্ছে হয়েছিল, এগিয়ে গিয়ে দিদির হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে যত্ন করে ধরিয়ে দেয়।

তারা যে-পাড়ায় থাকে তা অতি বিচ্ছিরি পাড়া। গায়ে গায়ে টালির চালের বাড়ি। ঘেঁষাঘেঁষি পাড়া-প্রতিবেশী। কেউ তেমন ভদ্রলোক নয়। মেজাজ তিরিক্ষি, মুখের আগল নেই। মাঝে মাঝে এমন ঝগড়া লাগে যা সকাল থেকে একনাগাড়ে রাত অবধি চলে। আর যেসব নোংরা কথা, সেগুলো যেন নরক মন্থন করে উঠে আসে। কিন্তু আবার বিপদে-আপদে বুক দিয়ে এসে আগলায়ও তারাই।

মোট চারটি কাঠি নষ্ট করেছিল দিদি। পঞ্চম কাঠিটিই হয়তো জ্বলত। ঠিক সেই সময়ে আলুথালু হয়ে চিনু আর গৌরীমাসি এসে জাপটে ধরল ঝিল্লিকে। দেশলাই কেড়ে নিল, গায়ে জল ঢালল। আর তাদের দিকে চেয়ে অবাক গলায় গৌরীমাসি বলল, তোমাদের আক্কেলটা কী বলো তো? মেয়েটা মরছে আর তোমরা দাঁড়িয়ে হাঁ করে তামাশা দেখছ?

মা তবু বিন্দুমাত্র নরম হল না। কঠিন গলায় বলল, মরলে বাঁচতুম।

বিনুমাসি আয়ুষ্মানকে একটা চড় কষিয়ে বলেছিল, তোর মা-বাবা না হয় ওরকম, তুই কী করছিলি? চোখের সামনে একটা সর্বনাশ দেখেও এক পা এগোলি না? এসব ছেলেপুলে পেটে ধরে লাভ কী? দুনিয়ার জঞ্জাল বাড়ানো।

সেই একটা শিক্ষা হল আয়ুষ্মানের। বাস্তবিকই সে হাঁ করে মন দিয়ে মজাই দেখছিল। দিদি কতবারের চেষ্টায় দেশলাইটা জ্বালাতে পারে তা-ও হিসেব করছিল। কিন্তু ও সময়ে তারও যে কিছু করা উচিত, তা তার একবারও মনে হয়নি তো! এ কথা ঠিক যে, দিদি তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। ঝিল্লি কোথায় কোথায় যায়, কার কার সঙ্গে মেশে, কবে কার সঙ্গে স্কুল পালিয়ে ম্যাটিনি শো দেখতে গিয়েছিল, সব এসে মাকে বলে দেয় আয়ুষ্মান। দিদি তাই আজকাল তাকে ভাইফোঁটা দিতে চায় না, রাখি পরায় না। কথাবার্তাও বিশেষ নেই। কিন্তু তা বলে দিদি মরে যাক এটাও কি সে চায়? মনে বড় গ্লানি হয়েছিল আয়ুষ্মানের।

চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে তার দুটো ভাইবোন এসে হাঁ করে দৃশ্যটা দেখছিল। তখন টুকুসের বয়স আট, বাবলু অর্থাৎ অনির্বাণের চার। টুকুস তার কানে কানে জিজ্ঞেস করেছিল, কী হয়েছে রে দাদা?

দিদি গায়ে আগুন দিতে গিয়েছিল।

তাতে কী হত?

দিদি মরে যেত।

বাঃ, দিদি মরবে কেন? দিদির তো বোধনদার সঙ্গে বিয়ে হবে।

ভারী অবাক হয়ে আয়ুষ্মান বলল, বোধন? সে আবার কে?

টুকুস একটু ভেবেটেবে বলল, সে আছে একজন।

দূর! কে বোধন তারই ঠিক নেই।

টুকুস গম্ভীর মুখে বলেছিল, দেখিস।

বয়সের মেয়েদের নিয়ে এইসব সমস্যা কোনও অভিনব ব্যাপার নয়। পাড়ার ঘরে ঘরে এই নিয়ে মাঝে মাঝে তুমুল হয়। আবার অনেকে গায়ে মাখে না, যা করছে করুক। মারধর করে, ভয় দেখিয়ে লাভও হয় না তেমন। বয়সের ছেলেমেয়েরা বাগ মানে না কিছুতেই। তখন তাদের ওপর যেন ভর হয়। নিশিতে পায়, মা-বাবা-গৃহ সব তখন তুচ্ছ। মরলেও শোক হয় না তখন। পছন্দের পুরুষের সঙ্গে কত মেয়েই তো পালিয়ে গেল চোখের সামনে। কয়েক বছর পর তাদের কাউকে কাউকে ফের পাড়ায় দেখা যেত। দুটো-তিনটে বাচ্চার মা, বয়স ঝরে গেছে, চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি, রোগা হাতে ঢলঢল করছে শাঁখা-পলা।

আগল-পাগল যৌবনের আয়ু পদ্মপাতায় জলের মতো কতই না ক্ষণস্থায়ী। ন্যাড়া তবু বেলতলায় যাবেই।

আপনারা ব্রাহ্মণ! দণ্ডবৎ! দণ্ডবৎ!— বলে একদিন হাজির হলেন ভারী হাসিখুশি আহ্লাদে ভরা গোলগাল মুখের বলিহারি বৈরাগী। প্রথমে মনে হয়েছিল নকল নাম। তা নয়। মা-বাপ নাম রেখেছিলেন বলহরি। তা লোকে পেছনে লাগত। বলত, বলহরি হরিবোল। তা তিনি তখন নিজের নামটা বলিহারি করে নিয়েছিলেন। তাঁর মোটো ছিল, কৌশল করে বাঁচতে হয়, বুঝলে? নইলে বেঁচে থাকার উপায় নেই।

সে সেই প্রথম জানল যে, তারা ব্রাহ্মণ। দেবদ্বিজে এবং বিশেষ করে দ্বিজদের ওপর ভারী ভক্তি তাঁর। বলতেন, বামুনবাড়ির কুকুরটা বেড়ালটা অবধি ভাগ্যবান।

বাবার কোনওকালে পৈতে হয়েছিল কি না কে জানে। তবে জন্মাবধি বাবার গলায় পৈতে দেখেনি আয়ুষ্মান। তারও তেরো-চোদ্দো বছর বয়স অবধি পৈতে হয়নি, হওয়ার কথা ভাবেইনি কেউ। বেশ ছিল তারা। বলিহারি বৈরাগী এসে গোলযোগ পাকিয়ে তুলল। নিজের এঁটো চায়ের কাপটা অবধি কাউকে ছুঁতে দিত না।— বাপ রে! এ হল

বামুনবাড়ি, আমার এঁটো ছুঁতে দিতে পারি!

তার বাবা ভারী কাহিল গলায় একদিন বলল, আরে, কবে কোনকালে বামুন ছিলুম সে তো বিস্মরণ হয়ে গেছে মশাই। নিজেকে মানুষ বলেই মনে হয় না তো বামুন! পৈতে নেই, গায়ত্রী নেই, আহ্নিক নেই। ছাইভস্ম গিলছি। আমাদের ব্রাহ্মণত্ব কবেই ছেড়ে গেছে। এই তো সেদিন একটা সস্তা হোটেলে দুপুরে মাংসভাত খেতে গিয়ে মনে হচ্ছিল মাংসের রোঁয়াগুলো যেন বড্ড বড়।

বৈরাগী হাঁ হাঁ করে উঠে বলে, বামুনের বামনাই হল গিয়ে বাঘের গায়ে ডোরার মতো। ও কি যায়? জাত বাঘের বাচ্চা তো। হেলে ঢোঁড়ার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে তো চলবে না মশাই।

বেঁচে থাকার অনেকগুলো কৌশল ছিল বৈরাগীর। হোমিয়োপ্যাথি, জ্যোতিষী, মিউচুয়াল ফান্ড, ঘটকালি এবং জমিবাড়ির দালালি।

আর আশ্চর্যের বিষয়, এই সব ক'টা খাতেই অল্পবিস্তর আয় হত।

এ পাড়ায় বামুন-কায়েত-বৈশ্য-শূদ্র চেনার উপায় ছিল না। সব একাকার। বৈরাগী কয়েকদিন ধরেই আয়ুষ্মানের বাবাকে বলছিল, এবার একটা পৈতে পরুন তো বাবা, ভেতরের ঘুমন্ত বামুনটা ঝাঁকি মেরে উঠবে'খন।

বামনাই জাগিয়ে লাভ কী? বরং শিডিউল কাস্ট হলে খানিক সুবিধে হয়।

বামুনের কোনওকালেই পয়সা ছিল না বাবা। তারা চিরকাল মেগেপেতে খেত। তবু তেজ কিন্তু কম ছিল না। রাজা-মহারাজারা অবধি ওই ধুলোটে পায়ে গড়াগড়ি খেত।

বৈরাগী শেষ অবধি বাবাকে পৈতে ধরিয়েছিল। আর এক বৃষ্টির দিনে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে আয়ুষ্মানের নমো নমো করে পৈতে দেওয়া হয়েছিল।

ওই একটা নেশা ছিল বৈরাগীর, বামুন খুঁজে বের করার। তা এই এলাকায় খুঁজে পেতে বিস্তর বামুনকে আবিষ্কার করেছিল বটে

বৈরাগী। কেউ রিকশা চালায়, কেউ ডিম বেচে, কারও তেলেভাজার দোকান, গাড়ির ক্লিনার, ফিরিওয়ালা, এমনকী ভিখিরি অবধি। সেই খবর আনল, বাজারে যে-বয়স্কা মহিলা প্লাস্টিক বিছিয়ে ফুল বিক্রি করে সে নাকি ব্যানার্জি, অবশ্য ফুলওয়ালি বলেছিল, আমার বাপের দিকটা বামুন নয় বাপু। আমরা কাও-ক্যাওড়া তবে টনি বাঁড়ুজ্যে বামুন বটে। তা খুঁজেপেতে বামুন বের করে বৈরাগী কোন মহৎ কাজ করছে, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারত না আয়ুষ্মান।

রতনের গ্যারেজে কালিঝুলি মেখে এক ছোকরা কাজ করত। পরনে হাফ প্যান্ট, গায়ে তেলচিটে ময়লা জামা। গ্যারেজেই তার ঘরবাড়ি। কোথা থেকে এসে জুটেছিল কে জানে! বড় একটা রাস্তায়-ঘাটে বেরোত না। বটতলার রুটির দোকান থেকে রুটি-তরকারি কিনে খেয়ে নিত। নাম দেবদূত। কানাঘুষো শোনা যেত, সে নাকি পালিয়ে এসেছে। কোথা থেকে পালিয়েছে কিংবা কেন, তা অবশ্য কেউ জানত না।

আয়ুষ্মানের বাবা যতীন সেহানবিশের ট্যাক্সিটার ছোটখাটো মেরামতি মাঝে মাঝে রতনের গ্যারেজে হত। সেই সুবাদে একটু চেনা ছিল দেবদূতের সঙ্গে। রোগাটে চেহারা, একটু হাড়গিলের মতো শরীর, মুখখানা ভাঙাচোরা এবং গালে মাংস নেই। আর চাউনিটাও যেন কেমন কেমন। চোখে চোখ পড়লে অস্বস্তি হয়। ঠান্ডা চোখ, কিন্তু কেমন যেন পাথুরে দৃষ্টি।

ঝিল্লির সঙ্গে তার প্রেম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কত অসম্ভবই তো ঘটে। কবে তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও হৃদয় বিনিময় হল কে বলবে। কিন্তু হল। এটা সেই আগের মতো নানা ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোর বৃত্তান্ত নয়। ব্যাপার সিরিয়াস। এ পাড়ায় কিছুই গোপন থাকে না। থাকার উপায়ও নেই, চারদিকে প্রচুর নজরদার খাপ পেতে বসে আছে।

যতীন সেহানবিশ খুব একটা বীরপুরুষ নয় বটে, কিন্তু মাথায় রক্ত

উঠে গেলে কাপুরুষও খুনখারাপি করে বসতে পারে। সুতরাং এই প্রেমের বৃত্তান্ত মায়ের মারফত শুনে মেয়েকে ফের একপ্রস্থ ঠেঙিয়ে যতীন গিয়ে হাজির হল রতনের গ্যারাজে। দেবদূত তার আগমনবার্তা আগেই পেয়ে গিয়ে থাকবে। তাই সে হয়তো নিজেই গা-ঢাকা দিয়েছিল কিংবা রতন লুকিয়ে রেখেছিল তাকে। দেবদূতকে না পেয়ে রতনের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাবা, তুই ভেবেছিসটা কী? গ্যারাজ কি বৃন্দাবন? তোকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, ওই ছোঁড়াকে তাড়িয়ে দে। নইলে কিন্তু খুনোখুনি হয়ে যাবে। বেপাড়ার ছেলে, অজ্ঞাতকুলশীল, বেজন্মা সব এসে জোটে এখানে...

রতন ভেড়ুয়া নয়। সেও উলটে তড়পাল। বলল, অন্যকে শাসন না করে আগে নিজের ঘর সামলাও যতীনদা। দেবু তিন বছর আমার গ্যারাজে আছে, পাড়ার কোনও মেয়ে বলতে পারবে যে, কারও সঙ্গে কখনও ঢলাঢলি করেছে? তোমার মেয়েই তো হুটহাট এসে হাজির হয়। হাসি-মশকরা করে। ওর কীর্তি সবাই জানে যতীনদা, বেশি গরম দেখিয়ো না।

দু'-চার কথায় ধুন্ধুমার লেগে গেল। পাড়ার লোকেও দু'ভাগ, কতক যতীনের পক্ষে, কতক রতনের দিকে। কিন্তু সাব্যস্ত কিছুই হল না। শুধুমুধু দুই-তিন মনুষ্যঘণ্টা নষ্ট, মেজাজ নষ্ট, সম্পর্ক খারাপ, দূষিত বাক্য এবং নারকীয় গালাগালে খানিকটা বায়ুদূষণ। পরস্পরকে দেখে নেওয়ার আবহমানকাল ধরে প্রচলিত হুমকি দেওয়ার পর দু'পক্ষ অবশেষে নিরস্ত হল।

কিন্তু প্রেম সেখানেই থমকে গেল না। গড়িয়ে চলল। দিন সাতেক সতর্কতামূলক অদৃশ্য হয়ে থাকার পর দেবদূতকে আবার কালিঝুলি মেখে গ্যারাজের কাজ করতে দেখা গেল। আরও মাসখানেক পরে ঝিল্লিকেও গ্যারাজের রাস্তায় সেজেগুজে বিচরণ করতে দেখা যেতে লাগল।

দেবদূতকে নিয়ে একটা রহস্য ছিলই। ধূমকেতুরও ইতিহাস আছে।

সেটা অজ্ঞাত হলেও ইতিহাস। দেবদূতেরও তাই। সে তিলজলার লোক, কিন্তু কখনও সেখানে যায় না। সে গ্যারাজের বাইরে পাড়ায় বড় একটা প্রকাশিত হয় না। একটু যেন লুকিয়ে থাকে। লোকে তাকে এতকাল দেখেও দেখত না। আর পাঁচটা এলেবেলে লোকের মতোই সেও একজন। আছে তো আছে। নেই তো নেই। কিন্তু ঝিল্লির ঘটনাটার পরই বোধহয় লোকে বাতাস শুঁকতে শুরু করে।

ভুজিয়াওয়ালা শিউকুমার খুব গোপনে ফিসফিস করে লোকের কানে কানে যে-কথাটা বলে দিতে লাগল, তা আয়ুষ্মানদের বাড়িতে পৌঁছতে দেরি হল না। শিউকুমারের ভাতিজা তিলজলায় থাকে। সে সেখানে শুনে এসেছে দেবু একজন খুনিয়া এবং ফেরারি। তার নামে হুলিয়া আছে।

যাদের সামান্য আয়, সামান্য সঞ্চয় তাদের জমানো টাকা কোন ফিকিরে কতটা বাড়িয়ে তোলা যায়, তারই সুলুকসন্ধান দিত বলিহারি বৈরাগী। কত রকমের লগ্নির যে খবর রাখত তার হিসেব নেই। সকালে বসে একদিন ওইসব নিয়েই কথা বলছিল বৈরাগী। একটা ফর্ম ফিল-আপ করতে করতে হঠাৎ বলল, বিয়েটা লাগিয়ে দিন যতীনবাবু।

বাবা অবাক হয়ে বলে, বিয়ে! কার বিয়ে?

ঝিল্লির সঙ্গে বোধনের।

বাবা হাঁ করে চেয়ে থেকে বলে, বোধন! সে আবার কে?

ছোকরা জাতে বামুন।

বামুন! শুধু বামুন হলেই তো হবে না। করে কী?

বলিহারি কিছুক্ষণ চুপ করে ফর্ম ফিল-আপ করতে লাগল। ফের আচমকা মুখ তুলে বলল, তাহলে খোলসা করেই বলি। বোধন হল ওই দেবদূত!

শুনে বাবা ফের হাঁ। তারপর ভারী রেগে গিয়ে একটা ধমক মেরে বলল, খবরদার! ওর কথা উচ্চারণও করবেন না। দালালি দিচ্ছে নাকি আপনাকে? জানেন ছোকরা খুনের আসামি? ওর নামে হুলিয়া আছে!

পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে? জানেন এসব? বামুন! বামুন ধুয়ে কি জল খাব?

বলিহারি নির্বিকারভাবে ফর্ম লিখতে লিখতে ফের এক সময়ে মাথা তোলা দিয়ে বলল, খবরটা মিথ্যে নয়। বোধন অধিকারী খুনিই বটে। খবরটা পাকা। তবে যে-ঘটনায় খুনটা করেছিল তেমন ঘটনায় পড়লে আপনারও হয়তো খুন করতে ইচ্ছে যেত। তবে কিনা সকলেই তো আর মরদ নয়। চুল্লু স্বপনকে খুন করার মতো মুরোদ ক'জনেরই বা আছে!

বাবা উত্তেজিত হয়ে বলে, তাজ্জব কাণ্ড! সব জেনেশুনেও আপনি একজন খুনির সঙ্গে ঝিল্লির বিয়ে দিতে বলছেন?

বলিহারি ভালমানুষের মতো বলে, খুনটা যদি না ধরেন তাহলে ছেলে কিন্তু খারাপও নয়। এক নম্বর কথা হল, বামুন।

উঃ মশাই, আপনি তো দেখছি বামুন-খ্যাপা! কেবল বামুন বামুন বলে হেদিয়ে মরলে হবে?

এবার অনেকক্ষণ চুপ ছিল বলিহারি। তারপর ভারী নিরীহ গলায় বলল, ফলসা খেয়েছেন কখনও?

এত চট করে প্রসঙ্গ পালটে ফেলায় বাবা একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। বলল, হঠাৎ ফলসার কথা কেন? তা খেয়েছি ছেলেবেলায়।

এখন আর পাওয়া যায় না। যাদবপুরে উদ্বাস্তু কলোনি হওয়ার আগে ওই জায়গায় ফলসার জঙ্গল ছিল, জানেন? এখন একটাও ফলসার গাছ খুঁজে পাবেন না। বাজারেও পাবেন না। লটকা খেয়েছেন? মাদার ফল? পানিফল? তেফল? তিউয়া? খুঁজে পাবেন না। সব একে একে এক্সটিংট হয়ে যাচ্ছে।

তো! তাতে হলটা কী?

বড় ভয় হয় বাবা, বামুনও না বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর দুনিয়ায় বামুন না থাকলে সর্বনাশ!

পাগলের কথা শোনো। বামুন থেকেই বা কোন অষ্টরম্ভা হচ্ছে বলুন তো!

বৈরাগী কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এমন ভাব করে তার কাগজপত্রে ডুবে গেল। তারপর প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে মুখ তুলে বলল, দুনিয়ায় আর ক'টাই বা বামুন বলুন? এই পোড়া দেশেই যা হোক কিছু জন্মেছিল। চিনে-জাপানে নেই, ইংল্যান্ড-আমেরিকায় নেই, ইরাক-ইরানে নেই। আর যাও বা কিছু বামুন আছে, তারাও কতক পতিত হয়েছে, কতক ভুলেই গেছে তাদের আসল বর্ণ-গোত্র কী, কতক আছে নাস্তিক। তাই আমি ঘুরে ঘুরে কেঁচো খুঁড়ে সাপ বের করতে চেষ্টা করি মশাই।

তাতে লাভ কী?

আছে মশাই, আছে। দুনিয়া থেকে বামুন লোপাট হলে খুব খারাপ হবে। আগুনটা ছাইয়ের নীচে চাপা পড়ে আছে বটে, কিন্তু এখনও আছে। নিবে গেলেই সর্বনাশ।

দূর মশাই, আপনার যেমন কথা। যে-দেশে বামুন নেই তারাই তো লুটেপুটে খাচ্ছে। বামুনের দেশের অবস্থা তো দেখছি!

ওরকম মনে হয় বটে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝতেন, যার যত উন্নতি তার তত পতন। আলোর বিপুল ঝরার মতো, ঝকঝকে তার পতন তত।

ওসব হল হিংসের কথা।

বলিহারি ফের চুপ, কাগজপত্রে মন। কিছুক্ষণ পর ফের মাথা তুলে বলল, অমূল্য ঘোষকে যদি দেখতেন তাহলে বুঝতেন। অকালে বুড়িয়ে গেছে, ঘোলা চোখ, পরনে লুঙ্গি, আর ছেঁড়া গেঞ্জি। বিড়বিড় করে বকে আর পাড়ার রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। একটাই সন্তান ছিল তো! মাত্র বারো বছর বয়সের ছেলে।

বাবা বিরক্ত হয়ে বলল, কে অমূল্য ঘোষ? কার কথা বলছেন?

তিলজলার খান লেনের অমূল্য ঘোষ। ছেলেটার ব্লাড ক্যানসার

হয়েছিল। তবে শুরুতেই ধরা পড়েছিল বলে বেঁচে যাওয়ার চান্স ছিল। ডাক্তাররা ভরসা দিয়েছিল, নিরানব্বই পারসেন্ট রিকভারির।

অমূল্য ঘোষের গল্প শুনে আমাদের লাভ কী?

নাঃ, লাভ কিছু নেই। এরকম গল্প তো ঘরে ঘরে। তবে এটা আসলে অমূল্য ঘোষেরও গল্প নয়। কর্মফলই হবে বোধহয়। তবে তার বউ চুল্লু স্বপনের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। অমূল্য ঘোষ ভিতু মানুষ। থানা, পুলিশ করতে সাহস পায়নি। বউ স্বেচ্ছায় গেছে। পুলিশই বা কী করবে বলুন! বউ যখন পালায় তখন ছেলেটার বয়স সাত-আট হবে। ওই ছেলেই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান। বউ যে ছেলেটাকে নিয়ে যায়নি, এটাই যা বাঁচোয়া। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই বউ ডিভোর্সের মামলা করল। ভিতু অমূল্য মামলা লড়ল না, ডিভোর্স দিয়ে দিল। কিন্তু একমাত্র সম্বল বসতবাড়িটা চলে গেল বউয়ের হেফাজতে। অমূল্য ছেলে নিয়ে পাড়ায় একটা এক ঘরের বাসা ভাড়া করে থাকতে লাগল। আর তার কিছুদিনের মধ্যেই তার বউ মীনাক্ষী বাইপাসে গাড়ির ধাক্কায় অক্কা পেল। সাজানো অ্যাকসিডেন্ট মশাই। পরিষ্কার খুন। মীনাক্ষীকে আর দরকার ছিল না চুল্লু স্বপনের। বুঝলেন?

শুনছি।

চোখ বুজে একটু কল্পনা করুন তো! মনশ্চক্ষে লোকটাকে দেখতে চেষ্টা করুন। একটা আগাপাশতলা ভিতু লোক। কারও সঙ্গেই যুঝবার সাহস নেই। মারদাঙ্গা, খুন-জখমকে বড্ড ডরায়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না। বউ গেল, বাড়ি গেল, তবু ফুঁসে উঠতে পারল না। অনেকটা এই আমাদের মতোই। ছেলের যখন ক্যানসার ধরা পড়ল তখন চিকিৎসা করার পয়সাও নেই। ধারেকর্জে তল হয়ে সামান্য কেরানিগিরির টাকায় চেষ্টা করেছিল। আর পাড়ার লোক চাঁদা দিয়েছিল। কিন্তু ওতে কি আর হয়? অমূল্য ঘোষের বাড়ির পাশেই গঙ্গাপ্রসাদ অধিকারীর বাড়ি। তারা আগাগোড়া সব ঘটনা দেখেছে। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার। ফলে কোথাও একটা রাগও জমা

হচ্ছিল। ভদ্রলোকদের মুশকিল হল, তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে চায়, কিন্তু পেরে ওঠে না। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে পিছিয়ে যায়। গঙ্গাপ্রসাদের ছোট ছেলে হকি খেলত। লেখাপড়ায় তেমন দড় নয়। তবে খেলাধুলোয় ভাল। আর খুব একরোখা। অমূল্য ঘোষের ছেলেটা যেদিন মারা যায়, সেদিন শ্মশান থেকে ফিরে অনেক রাতে সে হকি স্টিক নিয়ে বেরিয়ে যায়। চুল্লু স্বপন সে রাতে কোথায় ছিল, সেই খবর নেওয়া ছিল তার। খান লেনের অনেক অলিগলি। রতুয়া নামে একটা মেয়ের সঙ্গে থাকত তখন। বাইরে দু'জন পাহারায় ছিল। তবে সতর্ক ছিল না হয়তো। দু'জনকেই মাথায় মেরে জখম করে। সাড়া-শব্দ শুনে চুল্লু স্বপন পিস্তল হাতে বেরিয়ে আসে। কিন্তু পেটে মদ থাকলে রিফ্লেক্স কাজ করে না। গঙ্গাপ্রসাদ অধিকারীর ছোট ছেলে তাকে ততক্ষণ মারে যতক্ষণ না মাথার খুলি ফেটে ঘিলু ছিটকে বেরিয়েছিল।

বুঝলাম। কিন্তু ধরা পড়লে যে ওর ফাঁসি হবে!

পুলিশের খাতায় ওর নাম নেই। পুলিশের কাছে চুল্লুর দলের কেউই বোধনের নাম বলেনি। তার কারণ, নিতান্তই সাদামাটা একটা ছেলে এসে হকি স্টিক দিয়ে চুল্লু স্বপনের মতো রুস্তমের লাশ নামিয়ে দিয়ে গেছে, এটা বড় লজ্জার কথা। ওর নামে হুলিয়া নেই। পুলিশও খুঁজছে না। তবে চুল্লু স্বপনের শাগরেদরা ওকে পেলে কী করবে তা বলতে পারি না। ঘটনার পর অবশ্য তিন বছর কেটে গেছে। স্বপনের ঠেকও আর নেই। খান লেনে গিয়ে যদি বোধন অধিকারীর নাম করেন তাহলে সবাই কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম বাজাবে। সবাই জানে খুনটা কে করেছে, কিন্তু কেউ সাক্ষী দেবে না।

আপনি এতসব জানলেন কী করে?

ওই তো বললুম, গর্ত খুঁড়ে জাত সাপগুলোকে বের করতে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। এই করতে গিয়েই কত কিছু জানা হয়।

বৈরাগীদাদা, আপনি এত বামুন-ঘেঁষা, কিন্তু আপনি নিজেই তো বামুন নন।

ওরে বাবা, বামুন হওয়া কি সোজা কথা! কত জন্মের সুকৃতি থাকলে তবে বামুনঘরে জন্ম হয়।

তারপর আড়ালে-আবডালে কী হল তা কে বলবে? কিন্তু কয়েকমাস পরে শোনা গেল ওই বোধনের সঙ্গেই দিদির বিয়ে হবে। টুকুস সেই কবেই বলে রেখেছিল।

তাই মাঝে মাঝে সন্দিহান হয়ে আয়ুষ্মান জিজ্ঞেস করত, হ্যাঁ রে টুকুস, তুই আগের জন্মে সিদ্ধাই-টিদ্ধাই ছিলি নাকি?

টুকুস অবাক হয়ে বলে, সিদ্ধাই কী?

সিদ্ধাই কী তা আয়ুষ্মানও জানে না। মাথা খাটিয়ে বলে, ওই যারা মন্তর-তন্তর জানে, ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারে।

যাঃ, আমি মন্তর-তন্তর কী করে জানব?

আয়ুষ্মান নিতান্তই মাঝারি মেধার ছাত্র। যে-স্কুলে সে পড়ত সেটা নিতান্তই গরিবের স্কুল। সুতরাং মাধ্যমিক পরীক্ষার পর খুব টেনশন ছিল আয়ুষ্মানের। স্কুলের বেতন, বই কেনার টাকা বাবদ তার গরিব বাবার রোজগার অনেকটাই খসে যায়। ফেল্টুস মারলে টাকাটাই জলে গেল। রেজাল্টের সময় ঘনিয়ে এলে সে ঠিক করে রেখেছিল, ফেল হলে লেখাপড়া ছেড়ে পাকাপাকি কাজে ঢুকে যাবে। গাড়ি চালাতে সে ভালই পারে। বাবার কাছেই শিখে নিয়েছে। টুকটাক মেকানিকের কাজও। প্রথম কিছুদিন ট্যাক্সি চালাবে। তারপর টাকা জমিয়ে গ্যারাজ খুলবে। জীবনে এর চেয়ে অধিক কিছুই তো তার হওয়ার নেই।

রাতে মায়ের কাছে বসে রুটি বেলছিল টুকুস। আয়ুষ্মানের সেদিন ঠান্ডা লেগে জ্বর হয়েছে, প্রচণ্ড সর্দি। ছোট্ট টিভিতে একটা ওয়ান ডে ম্যাচ দেখছিল। হঠাৎ টুকুস বলল, দাদা, তুই কিন্তু স্টার পাবি।

আয়ুষ্মান কথাটা বুঝতে পারেনি। বলল, কী পাব?

স্টার। মাধ্যমিকে।

আয়ুষ্মান একটু হাঁ করে থেকে বলল, ওরে আমার সিদ্ধাই রে!

পাশ নম্বর পাব কি না তারই ঠিক নেই, তার ওপর স্টার!

দেখিস।

থাক, তোকে আর সিদ্ধাইগিরি করতে হবে না। আমাদের স্কুলের ফার্স্ট বয়ও স্টার পায় না, তা জানিস?

টুকুস জবাব দিল না। বেশি কথা বলেও না কখনও।

আশ্চর্য এই, একমাস বাদে যখন ফল বেরোল, তখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে এবং নিজেও প্রচণ্ড অবাক হয়ে আয়ুষ্মান দেখল, সে সত্যিই স্টার পেয়েছে।

বাড়ি ফিরেই সে প্রথমে টুকুসকে পাকড়াও করল, কী করে বললি যে, আমি স্টার পাব?

টুকুস ভারী লজ্জা পেয়ে বলে, বাঃ রে, আমি তো একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, তুই স্টার পেয়েছিস!

দাঁড়া, পাড়ায় রটিয়ে দেব যে, তুই বাক্‌সিদ্ধাই। তাহলে ঘরে বসেই তোর অনেক রোজগার হবে।

স্টার-ফার পেলে প্রথমটা একটু গা গরম হয়ে যায় ঠিকই। কিন্তু এ হল চৌবাচ্চায় কুমির পোষার মতোই বেমানান ব্যাপার। চোখে নানা রকম মাল্টিকালার স্বপ্ন চলে আসে, একদিন কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠবে বলে মনে হতে থাকে। পুরো ফালতু ব্যাপার। ধরা যাক, সে যদি হায়ার সেকেন্ডারিতেও স্টার প্যাঁদায় এবং জয়েন্টেও চান্স পায়, তাহলেও কি তার বাপ পারবে তাকে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে? কিন্তু মুশকিল হল স্টার পাওয়াতে সেই অসম্ভব চেষ্টাটা হয়তো তার বাবা যতীন সেহানবিশ করবে ধারেকর্জে তলিয়ে গিয়েও। তাতে সংসারটাই চিমড়ে হয়ে যাবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদে গিয়ে তার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, স্যার, আমার স্টার কেড়ে নিয়ে শুধু পাশমার্ক দিন। নইলে ওই স্টার আমাদের ভুলভাল স্বপ্ন দেখাবে, ভুলভাল পথে ঠেলে দেবে। স্টারই আমাদের খেয়ে ফেলবে।

খেয়েও নিত। যতীন সেহানবিশের মুখের হাসির আর চোখের

দীপ্তি দেখে সেটাই সন্দেহ করছিল আয়ুষ্মান। তার মায়ের রসকষহীন মুখখানায় যেন হঠাৎ লাবণ্য এল। একমাত্র আয়ুষ্মানই জানে, সে মোটেই মেধাবী নয়। খুব উঁচুতে ওঠার যোগ্যতা তার নেই। মাধ্যমিকের স্টার একটা অঘটনমাত্র।

শেষ অবধি অবশ্য মাধ্যমিকের স্টার তাদের খুব একটা ক্ষতি করতে পারেনি। কলকাতায় মে মাসের তপ্ত গরমে তার বাবা একদিন ট্যাক্সির মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে যায়। অন্য ট্যাক্সিওয়ালারাই নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। বারো ঘণ্টা মেঝেয় পড়ে থাকার পর ডাক্তারবাবু দেখেন। বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার নিদান দেওয়া হয়। দিন পনেরো বাদে বোঝা যায়, যতীন সেহানবিশের ডান দিকে আংশিক পক্ষাঘাত।

আকস্মিক বটে, তবে এরকম তো হয়ই। আয়ুষ্মানের তখন বারো ক্লাস। পড়াশুনো পাশে সরিয়ে রেখে সে মালিককে ধরে বাবার ট্যাক্সিটা চালানোর অনুমতি পেয়ে গেল। মা-বাবা দু'জনেই আপত্তি তুলেছিল বটে, কিন্তু আয়ুষ্মান জানে মায়ের আয়া সেন্টার থেকে যা আয় হয় তাতে গ্রাসাচ্ছাদন চালানো মুশকিল।

বাবা হাল ছেড়ে দিয়ে ভারী হতাশার গলায় বলে, শেষে তুই যদি সেই ট্যাক্সিই চালাস তাহলে আর লাভ হল কী?

এটা আপদ্ধর্মই বলে ধরে নাও না কেন?

যখন প্রথম ট্যাক্সি চালাতে শুরু করি তখন আমারও ধারণা ছিল এটা আপদ্ধর্মই। তো তাই করে যেতে হল। বিএসসি পাশের সার্টিফিকেটটা আর বেরই করতে হল না কোনওদিন।

কী আর করা যাবে বলো।

তার চেয়ে বরং প্রাইভেট গাড়ি চালা। বাঁধা মাইনের চাকরি বটে, কিন্তু লেখাপড়ার সময় পাবি। ট্যাক্সি চালালে সময়ও পাওয়া যায় না, শরীরেও দেয় না।

ঠিক আছে। ভেবে দেখব।

একদিন সকালে ট্যাক্সি নিয়ে বেরোতে যাচ্ছে, হঠাৎ টুকুস কাছটিতে এসে তার হাত ধরে ভারী করুণ সুরে বলল, দ্যাখ দাদা, তুই তো দেখতে কুচ্ছিৎ, আর ভীষণ বোকা। দুম করে কোনও মেয়েকে প্রেম নিবেদন করিস না কিন্তু। অপমান হবি। তোকে কেউ অপমান করলে আমার খুব কষ্ট হয়।

কথাটা মনে গেঁথে রইল আয়ুষ্মানের।

ওই যেইখানে হরিণঘাটার পুরনো পরিত্যক্ত দুধের ডিপোটা রয়েছে, ওই মোড়ের ওপাশেই ভারতের সংবিধান থেকে গেছে। ভেতরে ঢুকতে পারেনি। উত্তরে রেলবাঁধ, দক্ষিণে ঘোষপাড়া আর পশ্চিমে দুর্গাচরণ প্রাইমারি স্কুল। মাঝখানে এই সংবিধানমুক্ত এলাকা। প্রশাসনও এখানে কদাচিৎ ঢোকে, নিতান্তই খুনখারাপির মতো গুরুতর অপরাধ ঘটলে। এ একরকম মুক্তাঞ্চল। তা বলে কি রবীন্দ্রজয়ন্তী হয় না? হয়। স্বাধীনতা বা প্রজাতন্ত্র দিবস, নেতাজির জন্মদিন, রক্তদান শিবির তা-ও হয়। ফাঁকে ফাঁকে চোলাইয়ের ঠেক, জুয়ার আড্ডা, অস্ত্রের আমদানি-রফতানি, ডাকাত বা খুনির আনাগোনা সবই মিলেমিশে আছে। আয়ুষ্মান জন্মাবধি বুঝে গিয়েছিল যে, এখানে টিকে থাকতে হলে মার খেয়ে ও মেরে থাকতে হবে। স্ট্রিট ফাইট কাকে বলে, তা সে ভালই জানে। বোমা পড়লে বা গুলি চললে, কিংবা ছোরাছুরি আর রড বেরোলে সহজে ঘাবড়ে যায় না। এসব মোকাবিলা করতে সে বাল্যকাল থেকে পাড়ার দাদাদের কাছে পাঠ নিয়েছে। এর মধ্যেই আছে তাদের ডু-গুডার ক্লাব, যারা এলাকাকে হাঙ্গামা ও সমাজবিরোধী মুক্ত রাখতে বিস্তর চেষ্টা করেছে। মদ আর জুয়ার ঠেক তারা কম ভাঙেনি। কিন্তু রক্তবীজের মতো ভাঙা ঠেক ফের নতুন ঠিকানায় গজিয়ে ওঠে।

গরিবের প্রকৃত ভগবান মাত্র দু'জন। শনি আর শীতলা। তা বলে এখানে দুর্গা, সরস্বতী, বিশ্বকর্মার পুজো বা শিবরাত্রি হয় না তা নয়। ওসব দেবদেবী শনি আর শীতলার কাছে চার-পাঁচ গোলে হেরে বসে

আছেন। শনি একজন নেগেটিভ দেবতা। তিনি মানুষকে কী দেন সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল শনির কোপে পড়লে সর্বনাশ। সেই ভয়ে তাঁকে সর্বদা তুষ্ট রাখতে হয়। আর অসুখ-বিসুখের নিদান হচ্ছেন মা শীতলা। ডাক্তারবাবুদের চেয়েও শীতলার ওপর মানুষের ভরসা বেশি।

এখানে রাত এগারোটার পরও মাইক বাজে। সারারাতও বাজে এবং প্রায় রোজই বাজে। বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পুজো, অন্নপ্রাশন, তারকেশ্বর যাত্রা একটা কিছু হলেই মাইক চলে আসে। মাইক হল এলাকার স্ট্যাটাস সিম্বল, প্রেস্টিজ ইস্যু। মাইক না বাজালে তোমার অনুষ্ঠানকে দুয়ো দেবে লোক। শুধু এই এলাকায় মাইক ভাড়া খাটিয়ে লাল হয়ে গেল পটল আর সমর। খবর দেওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই তারা চোঙা বা বক্স স্পিকার মিউজ়িক সিস্টেম আর সিডি নিয়ে চলে আসে, ফটাফট ফিট করে দিয়ে যায়।

এই মুক্তাঞ্চলেও ধীরে ধীরে ভদ্রলোকেরা ঢুকে পড়ছে। এই যারা আইন-কানুনকে ভয় পায়, সংবিধানের কথা জানে, সত্যনারায়ণের সিন্নি দেখলে যারা আঁতকে ওঠে, যাদের আইনানুগ বিয়ে এবং ডিভোর্স হয় এবং যাদের ছেলেমেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে বড় হয়ে আমেরিকায় চলে যায় এবং ফিরে আসে না। রফিক আলির জমিতে যে-বস্তিটা ছিল, তারা প্রোমোটারের দেদার টাকা পেয়ে উঠে গেল এবং সেইখানে উঠল জি প্লাস ফোর ফ্ল্যাটবাড়ি 'জয়শ্রী'।

মাইক বাজানো নিয়ে ল্যাটাটা লাগল ওই জয়শ্রীর সঙ্গেই। অন্তত জনা তিনেক হার্ট পেশেন্টের অবস্থান জয়শ্রীতে। সঙ্গত কারণেই তারা শীতলা পুজোর উদ্যোক্তাদের কাছে আপত্তি জানাল, রাত এগারোটার পর মাইক বন্ধ করতে হবে। কমিটি তেড়ে উঠল— তার মানে? মামাবাড়ির আবদার নাকি? এখানে এটাই ট্রাডিশন। না পোষালে বালিগঞ্জে গিয়ে থাকুন।

ভদ্রলোকেরা সাধারণত মুক্তাঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে পেরে ওঠে

না। কারণ মুক্তাঞ্চলে এখনও জঙ্গলের আইনই বলবৎ। কথায় কথায় বেরিয়ে আসে রড, বোমা, পিস্তল। আর তার চেয়েও মারাত্মক খিস্তি।

সুতরাং জয়শ্রী পিছু হটে গেল। আর সেটা হটে গেল একজন অতিশয় ক্ষুরধার বুদ্ধিওয়ালা মানুষের জন্য। গোপাল সেন। গোপাল সেন একজন অল্পবয়সি উকিল, মুখে সর্বদাই স্মিত ভাব। নরম কথাবার্তা। কিন্তু চট করে মানুষকে বশ করতে পারেন। বলতে কী, তাঁরই মধ্যস্থতায় একটা আপসরক্ষা হল। শীতলা কমিটির লোকজনরা গোপাল সেনকে পছন্দ করে ফেলল। হাতে একজন উকিল থাকাও যে দরকার, এটা নানা কারণে মুক্তাঞ্চলের লোকেরা টের পাচ্ছিল।

গোপাল সেনকে রোজ সকালে হাইকোর্টে নিয়ে যেত যতীন সেহানবিশ। বাঁধা ট্যাক্সি। বাবা বসে যাওয়ায় কাজটা করছিল আয়ুষ্মান। একদিন গোপাল সেন বললেন, তুই নাকি মাধ্যমিকে স্টার পেয়েছিলি?

হ্যাঁ।

পড়বি না আর?

পড়ছি। তবে স্কুলে যেতে পারি না।

তোর কোষ্ঠী আছে?

কুষ্ঠি? কে জানে! মায়ের কাছে আছে একটা বোধহয়।

নিয়ে আসিস তো। একটু দেখব।

কুষ্ঠি দেখলেন গোপাল সেন। তারপর বললেন, তোর নাম আয়ুষ্মান কে রেখেছে?

বাবাই বোধহয়। ঠিক জানি না।

নামটা চলবে না। তোর নাম হবে বর্গীয় জ দিয়ে।

কিন্তু আমার স্কুলে, রেশন কার্ডে সব জায়গাতেই তো আয়ুষ্মান আছে।

সেটা থাক। এফিডেভিট করে নামটা পালটে নে। লোকে এসব

নিয়ে ভাবে না, কিন্তু এসব ছোটখাটো ব্যাপারও খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আর ট্যাক্সি চালানো ছাড়। আমার ভগ্নীপতি নতুন গাড়ি কিনছে। সেইটে চালাবি। লেখাপড়ার সময় পাবি তাহলে।

কী নাম নেবে সে? যখন আকাশ-পাতাল ভাবছে তখন টুসকি বলল, তোর নাম জোয়ার।

তিন

বুধাদিত্যকে সে অন্তত চারবার খুন করেছে। চারবারই পিস্তল চালিয়ে। খুন করার পরই তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠেছে ভয়ে, অনুশোচনায় এবং বিস্ময়ে। আমি এ কী করলাম? এত বড় ভুল আমি কী করে করতে পারি?

বুধাদিত্য যে আজও বেঁচেই আছে তার একটা কারণ, নন্দিনীর পিস্তল নেই। পিস্তল সে কখনও চোখেই দেখেনি, সিনেমা-থিয়েটার ছাড়া। আর খুনগুলো হয়েছে স্বপ্নে। স্বপ্নে হলেও নন্দিনী খুনটা বাস্তবেও করতে চায় মাঝে মাঝে। তার খুব ইচ্ছে করে।

বুধাদিত্যের শরীরের ঘ্রাণ বন-জঙ্গলের গন্ধের মতোই সোঁদা ও সুন্দর। তার মুখেও শিশুর মুখের মতো নিষ্পাপ শ্বাস। কাঁধ মহিষের মতো জোরালো। বুধাদিত্য পশুর মতো কামুক।

ভোররাতে আজ স্বপ্নটা দেখেছে নন্দিনী। এই নিয়ে চারবার। না, চারবার হলেও চার রকম। আজ ভোররাতে দেখল, সে একটা ঘরে একটা মাত্র চেয়ারে বসে আছে। ঘরটা বিশাল। এতই বড় যে, একটু ভয়-ভয় করে। কোনও আসবাব নেই। এই একটা মাত্র চেয়ার ছাড়া। সাদা মার্বেলের মেঝে উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। তার সামনে অনেকটা দূরে একটা দরজা। বন্ধ। সে অপেক্ষা করছে। একটু বাদেই তার অধৈর্য প্রেমিক বুধাদিত্য আসবে। সে জানে।

বুধাদিত্যের জন্যই সে আজ খুব সেজেছে। এরোটিক সাজ। বুকে শুধু একটা ঝলমলে পাথর বসানো কাঁচুলি, তলায় একটা কালো ঘাগরা, পায়ে হাই হিল। তার মনে একটা দাউ দাউ আগুন জ্বলছে, বুধাদিত্য কেন তাকে আগের মতো ভালবাসে না? কেন আরও

আরও ভালবাসে না? বুধাদিত্য কেন আর তার জন্য পাগল নয়? কেন বুধাদিত্য কুকুরের মতো বিশ্বাসী থাকছে না আর? বুধাদিত্য দূরে সরে যাচ্ছে? কেন যাবে? কেন যেতে দেবে সে?

বুধাদিত্যর একটা বউ আছে, সরিতা। তা থাক না। নন্দিনীরও তো একটা বর আছে! তাতে কী যায় আসে! কী যায় আসে তাতে? বুধাদিত্যের আরও একশোটা বউ থাকলেও সে শুধুই নন্দিনীর। যেমন নন্দিনীও শুধুমাত্র বুধাদিত্যের।

কিন্তু ঠিক সেরকমটা কেন হচ্ছে না আর? কেন নন্দিনীর মনে হচ্ছে, বুধাদিত্যর চোখে নন্দিনীর জন্য সেই আগ্রাসী, হিংস্র ক্ষুধা আর নেই?

দরজাটা খুলে যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, খুলে যাচ্ছে, তবে খুব ধীরে ধীরে। না, তাহলে বুধাদিত্য নয়। বুধাদিত্য যখন আসে তখন ঝড়ের মতো। পটাং করে দরজা খুলে চলে আসে যেন লুটেরা। এমন চোরের মতো, সসংকোচে তো তার আসবার কথা নয়?

কিন্তু নন্দিনী অবাক হয়ে দেখল, দরজা খুলে জড়োসড়ো বুড়ো মানুষের মতো এ তো বুধাদিত্যই! মুখে অপরাধী ভাব। চোখে পাপ-পুণ্যের ভয়! নন্দিনীর ভেতরটা ফোঁস করে ওঠে। ও এরকম কেন? এরকম কী করে হতে পারে তার দুরন্ত প্রেমিক!

দরজা থেকে নন্দিনীর কাছে আসতে কত সময় লাগছে বুধাদিত্যর! পায়ে যেন ভার বাঁধা। গতি নেই, উদ্দীপনা নেই, আকর্ষণ নেই। ও কি বুধাদিত্য? না তার মৃতদেহের মমি? যেন অফুরান পথ পার হয়ে এল। জোরে শ্বাস টানছে। চোখে চোখ রাখতে পারছে না।

হাঁটু গেড়ে বসে স্খলিত কণ্ঠে বলল, আমাকে রেহাই দাও নন্দিনী। আমি মুক্তি চাই।

নন্দিনী নিষ্ঠুর গলায় বলল, তুমি কে? চিনি না তো!

আমি বুধাদিত্য, নন্দিনী।

তুমি সে নও। লুক অ্যালাইক মাত্র।

আমাকে মুক্তি দাও নন্দিনী।

নন্দিনীর চোখ ঝলসে উঠল। শরীরে বিদ্যুৎ খেলা করে গেল। বুক থেকে আগুনের শিখা লকলক করে উঠে গেল তার মাথায়। সাপের মতো হিসহিস করে সে বলল, কার বকলস গলায় পরেছ আজ বুধাদিত্য? কার খাঁচায় দানাপানি খাচ্ছ?

বুধাদিত্যর দিকে তাকিয়ে তার বড় কষ্টও হল! এই পতন, এই মৃত্যু কি সহ্য করা যায়?

কোথা থেকে হাতে পিস্তল এল কে জানে! ঠিক পিস্তলও নয়। অনেকটা মোবাইল ফোনের মতো দেখতে। হ্যাঁ, মোবাইল ফোনই। তবে তাতে অপশনে গেলেই পিস্তল হয়ে যায়।

পরপর দু'বার গুলি করল নন্দিনী। হেঁচকি তোলার মতো শব্দ হয় নাকি পিস্তলে? তাই তো হল। দুটো গুলি আবিরের মতো রঙিন ধোঁয়া ছেড়ে বুধাদিত্যের কপালে দুটো টিপ পরিয়ে দিল যেন।

বুধাদিত্য মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

দু'হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠল নন্দিনী, এ আমি কী করলাম! এত বড় ভুল আমি কী করে করতে পারি?

নিজের আর্তনাদেই বোধহয় ঘুম ভেঙেছিল নন্দিনীর। তারপর বুকের মধ্যে আন্দোলিত হৃৎপিণ্ডের তুমুল শব্দ শুনতে হল তাকে।

বুকের এই অচেনা শব্দটার জন্ম হয়েছিল চার বছর আগে। তার হৃৎপিণ্ডের আন্দোলন এরকম ছিল না কখনও। চার বছর আগে যখন বিয়ে হল, বর হল, বরের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা আর মাখামাখি হল, তখনও হৃৎপিণ্ডের তেমন আন্দোলন ছিল না। হৃৎপিণ্ডের যে-সনাতন শব্দটি আছে, সেটিই টের পাওয়া যেত তখন। তার বিয়েতে আমন্ত্রিত বুধাদিত্যও এসেছিল, তার বরের বন্ধু। তখন আরও দশজনের মধ্যে তেমন চোখেই পড়েনি তাকে। বিয়ের পরে যে-কয়েকটা গেট টুগেদার হল তাতেও বুধাদিত্যকে কয়েকবারই দেখেছে সে, কথা বলেছে,

হাসি-ঠাট্টা করেছে। তখন বুধাদিত্য ছিল, আবার ছিলও না।

একটা মানুষের জীবনে অনেক মানুষ ভিড় করে আসে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত বা মুখচেনা দোকানদার ফেরিওয়ালা, বিমার এজেন্ট, সহকর্মী, কাজের লোক, ড্রাইভার। কিন্তু মাঝে মাঝে ওই ভিড় থেকে হয়তো হঠাৎ একজন একা বেরিয়ে আসে। বিধিবদ্ধ যে-সম্পর্ক ছিল তা দুম করে পালটে যায় তখন। নিয়ম হল, নদী তার দু'টি তীরের মাঝখান দিয়ে বরাবর লক্ষ্মী মেয়ের মতো বয়ে যাবে। কিন্তু যখন বন্যার জল ধেয়ে আসে, তখন কি সে আর বিধিবদ্ধ তীরের নিষেধ মানে! সব নিয়ম-কানুন উলটে দিয়ে মানুষের ঘটি-বাটি গেরস্থালি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মানুষ তো চোখ রাঙিয়ে কত সম্পর্ক বেঁধে দিয়েছে।

একদিন বৃষ্টির এক সন্ধেবেলায় বুধাদিত্যকে সত্যিকারের চোখে পড়ল নন্দিনীর। সরিতাকে নিয়ে এসেছিল তাদের বিবাহবার্ষিকীতে নেমন্তন্ন করতে। বুধাদিত্য বেশ লম্বা-চওড়া পুরুষ, তবে মুখে একটা স্থায়ী বিষণ্ণতার ছাপ আছে। একটু আনমনা, ভুলোমন। লোকটা পাহাড়ে ওঠে বলে শুনেছে নন্দিনী। সরিতা সুন্দরীর পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু হাসিখুশি, সোজা-সরল মেয়ে। দু'জনের বেশ ভাবসাব।

মুখের বিষাদটা নিয়েই ভাবছিল নন্দিনী। মজার কথায় হাসছে ঠিকই, কিন্তু চোখ দুটো কোন দূরের দিকে চেয়ে আছে যেন। কথাও বেশ কম। কথা তেমন গুছিয়ে বলতেও পারে না।

বিকেলের সংক্ষিপ্ত দেখাটুকু কিন্তু ওদের বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হল না। খুব সন্তর্পণে আর একটা গোপন দরজা খুলে নন্দিনীর মনের মধ্যে ঢুকে পড়ল বুধাদিত্য। এবং সারারাত জ্বালাতন হল নন্দিনী। নানা যুক্তি সাজিয়ে এই অনুপ্রবেশকে ঠেকানোর অনেক চেষ্টা করল সে। কিন্তু অবসন্ন মনে একসময়ে তার প্রতীয়মান হল, আসলে সে বুধাদিত্যকে ঠেকাতেই চাইছে না।

পরের রোববার ওদের বিবাহবার্ষিকীতে যাওয়ার জন্য খুব সাজল

নন্দিনী। এবং এটা জেনেই সাজল যে, সে আজ একটা লোককেই ইমপ্রেস করতে চায়। আর কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করলেও চলবে।

বুধাদিত্যদের বেশ পয়সা আছে। ওর বাবার চারটে গয়নার দোকান। বিশাল চারতলা বাড়ি গড়িয়ায়। বড় বড় ঘর, বিশাল বারান্দা, পোর্টিকো, দরদালান, প্রকাণ্ড ডিনার কাম কনফারেন্স রুম। শ'দেড়েক নিমন্ত্রিতের ভিড় সেখানে। ককটেল আর ডিনার।

অন্তত বার দশেক চোখে চোখ হয়েছিল তাদের।

আচ্ছা, আপনার মুখটা এত মেলানকলিক কেন বলুন তো? কোনও প্রেমিকা ডিচ করে যায়নি তো!

ভারী লাজুক হাসি হেসে বুধাদিত্য বলে, সবাই তাই বলে, আসলে আমার মুখটাই ওরকম।

তার মানে কি ধরে নেব, যে আপনি সত্যিই মেলানকলিক নন?

আছি হয়তো একটু। হয়তো একটু ইনট্রোভার্ট বলেই।

আমি পুরুষমানুষকে ভয় পেতে ভালবাসি না।

আমাকে দেখলে কি আপনার ভয় করে?

ভয় হয়তো করে না, কিন্তু একটু ভয়-ভয় করে।

নন্দিনীর এ কথাটা খুব পছন্দ হল বুধাদিত্যর। হেসে আপনমনে কয়েকবার কথাটা আওড়াল, ভয় হয়তো করে না, কিন্তু একটু ভয়-ভয় করে। তারপর একটা জোর মাথা নাড়া দিয়ে বলল, যাঃ, কী যে বলেন! আমাকে কেউ ভয় পায় না তো!

আমি পাই।

আর একটু মেলামেশা হলেই ওটা কেটে যাবে। তখন দেখবেন আমি অত্যন্ত নিরীহ একজন প্রাণী।

খুব নিরীহ হওয়াই কি ভাল? পুরুষমানুষ একটু দুষ্টু না হলে হয়?

কথার পিঠে কথা বলার মতো স্মার্ট বুধাদিত্য নয়। তার একটু কথার অভাব আছে। এটা টের পেয়েছিল নন্দিনী। যারা অগভীর তাদের কথা

বেশি। তাই তার কথাটার জবাব দিল না বুধাদিত্য। শুধু লজ্জার হাসি হাসল।

হৃদ্‌যন্ত্রের শব্দটা সেদিনই বদলে গেল তার। নতুন একটা শব্দ হচ্ছে যেন বুকে। নতুন পদধ্বনির মতো। আর নন্দিনীর ভেতরে এক স্বৈরিণী খুব গোপনে, নিঃশব্দে দরজার খিল খুলে দেওয়ার জন্য হাত তুলে আছে।

উকিলদের পসার হতে সময় লাগে। অনেকের হয়তো শেষ অবধি পসারই হয় না। কিন্তু তার বর গোপাল যেন একজন অত্যন্ত ক্ষুরধার বুদ্ধিওয়ালা লোক। প্রথম প্রথম কলেজের অধ্যাপনা আর ওকালতি পাশাপাশি করত গোপাল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝল, তার ভেতরে যে-প্রতিভাটি ঘুমিয়ে আছে তা কোনও নিরামিষ অধ্যাপকের নয়। বরং একজন দোর্দণ্ড উকিলের। ফলে দু'নৌকো ছেড়ে সে এক নৌকোর সওয়ারি হল। এখন তার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। মক্কেলের ভিড়ে সকাল থেকে অনেক রাত অবধি সে ঘেরাও হয়ে থাকে।

ব্যস্ত স্বামীর একলা বউ। সারাদিন একা একা আর ভূতের সঙ্গে কথা বলা। খুব সাহস করে একদিন বুধাদিত্যকে দুপুরবেলায় ফোন করল সে।

কী করছেন?

ওঃ আপনি! কী খবর?

কী আর খবর! একাকিনী, শোকাকুলা। আমার তো কোনও খবর নেই। আপনাদের কত কাজ! খুব ব্যস্ত বুঝি এখন?

দোকান সামলাচ্ছি। পেটের ধান্ধা।

শুধু পেটের খিদে মিটলেই হবে? আর কোনও খিদে নেই?

ওপাশটা চুপ। ভাবছে, কী বলবে, নন্দিনীর হাসি পাচ্ছিল। বেচারা কথা খুঁজে পাচ্ছে না। অনেকক্ষণ বাদে একটা ক্ষীণ গলা এল, আছে তো।

লোকটা ভিতু। লোকটা পিউরিটান। লোকটা প্রাচীনপন্থী। কাজেই একটু সময় লেগেছিল নন্দিনীর। বাঁধে সামান্য একটু চিড় ধরাতে পারলেই হয়। পাগল জল সব উড়িয়ে দিয়ে বিপথে ছুটে যাবে।

বাঁধটা শক্ত ছিল বুধাদিত্যর। আসামের নগাঁও গিয়েছিল গোপাল। মামলার কাজে। তাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল। নন্দিনী যায়নি। এক বৃষ্টির দিনে বুধাদিত্যকে তার একাকিত্বের কথা স্খলিত মনে করুণভাবে জানিয়েছিল নন্দিনী। বুধাদিত্য আসেনি। কী লম্বা সন্ধে কাটাতে হয়েছিল সেদিন নন্দিনীকে!

একদিন হঠাৎ দুপুরে বুধাদিত্যদের গড়িয়াহাটার শো-রুমে হানা দিল নন্দিনী। বেশ কয়েকজন কাস্টমার ছিল দোকানে। ক্যাশ কাউন্টারের পেছনে বুধাদিত্যর আলাদা একটা কিউবিকল। কারও সঙ্গে জরুরি কথা বলছিল। নন্দিনীকে দেখতে পেল একটু পরে। তাড়াতাড়ি উঠে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, আরে আপনি?

কেন, আসতে নেই বুঝি?

ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। কিন্তু খবর দিয়ে এলে ভাল করতেন। অনেক সময়ে আমাকে বেরোতে হয়।

আমার মন বলছিল, আপনি আজ থাকবেন।

তাই? আমি ভাগ্যবান। শপিং করতে এসেছেন কি?

না। শপ লিফটিং করতে এসেছি।

বুধাদিত্য একটু প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলল, করুন না। যা খুশি বেছে নিয়ে যান। বিল তো মেটাবে গোপাল।

গয়না নয় মশাই, দোকানের মালিককেই লিফটিং করতে চাই।

বুধাদিত্য হাসিটা গিলে ফেলল। একটু থতমত খেল। সামান্য লালও হল। চোখ নামিয়ে বলল, আজ প্রেশার আছে।

নন্দিনী জানে, খুব ভাল করে জানে, বুধাদিত্যের মুন্ডু সে অনেক আগেই ঘুরিয়ে দিয়েছে। লোকটার এই বাধো-বাধোটুকু কেবলমাত্র সংস্কারের একটা চৌকাঠ মাত্র। ওর চোখের দৃষ্টিতে মদিরতা ও লোভ

এসে গেছে। ভেতরে শুরু হয়েছে ছটফটানি। আর প্ররোচনার দরকার নেই। চৌকাঠ ও নিজেই ডিঙোবে। একখানা ছুরির ধারের মতো হাসিতে বুধাদিত্যকে বিদ্ধ করে চলে এল নন্দিনী। তারপর আর ফোন করল না। অপেক্ষা করতে লাগল।

মাত্র একদিন দ্বিধায় কাটিয়ে পরদিনই দুপুরের দিকে বুধাদিত্যর ফোন এল।

আজ কী করছেন?

পথ চেয়ে বসে আছি।

কার জন্য?

যার জন্য সে জানে।

বিকেলে ফ্রি আছেন?

আমি তো সবসময়েই ফ্রি।

গোপাল তার এক বড় মক্কেলের মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গেছে। সে থাকলেও খুব একটা ইতরবিশেষ হত না। কারণ গোপাল তার আইনের জগতে এতটাই নিমজ্জিত যে, বউ বদলে গেলেও টের পাবে না।

প্রথম দিনটাতেই কেলেঙ্কারি। বিকেল ছ'টায় গাড়ি নিয়ে এসেছিল বুধাদিত্য। ভীষণ নার্ভাস। গাড়ি ঠিকমতো চালাতে পারছিল না। নার্ভাসনেস কাটাতে বেশি কথা বলছিল। অপ্রাসঙ্গিক কথা। যে-ক্লাবে তাকে নিয়ে গিয়েছিল সেটা বেশ বড়লোকদের ক্লাব। এবং সেখানে মোটামুটি সবাই বুধাদিত্যকে চেনে দেখে নন্দিনী চাপা গলায় বলেছিল, এখানে এলেন কেন? এখানে প্রাইভেসিই তো নেই!

বুধাদিত্য হতবুদ্ধির মতো মুখ করে বলল, তাই তো। তাহলে কোথায় যাব?

কোনও অচেনা জায়গায় চলুন বুদ্ধু কোথাকার! এরকম বোকাকে নিয়ে যে কী করি!

অবশেষে একগাদা টাকা খরচ করে একটা হোটেলে এবং সেখানেও

পরের বউয়ের সংস্কার কাটাতে বেশি মদ খেয়ে ফেলল বুধাদিত্য এবং নিজের বউয়ের জন্য কান্নাকাটি করল। একটা দেহ-সম্পর্কও হল বটে, তবে না হলেই ভাল ছিল।

কিন্তু সেটা মাত্রই ছিল প্রথম দিন। তারপর থেকে আর কাঁচা ভুলগুলো হত না।

কিন্তু এই যে বাঁধা জীবন থেকে বিচ্যুতি, বুধাদিত্য সেটার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিল না। মাঝে মাঝেই বলে ফেলত, ভুল হচ্ছে না তো?

না বুধো, ভুল বলে ভাবছ কেন? প্রকৃতির দিকে তাকাও, তার নিয়ম তো মানুষের তৈরি করা সংস্কারে বাঁধা নয়।

সরিতা যদি জানতে পারে! গোপাল যদি জানতে পারে! আমার বাবার কাছে যদি খবর পৌঁছয়! নানারকম ভয় ও সম্ভাবনায় কণ্টকিত বুধাদিত্যর তাই প্রেমিক হয়ে উঠতে সময় লেগেছিল। তারপর ধীরে ধীরে সেইসব ভয়, সংকোচ, সংস্কার বিসর্জিত ময়লা ফেলার পাত্রে।

গোপন ও প্রকাশ্য দু'রকম জীবন যাপন করতে গেলে অভিনয়ে পটু হতে হয়। যখন গোপাল, সরিতা, নন্দিনী আর বুধাদিত্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কোথাও এক হত, তখন পরস্পরের প্রতি নিস্পৃহ ভাব বজায় রাখাটা ছিল জরুরি। কিন্তু বুধাদিত্য নার্ভাস হয়ে পড়ত, ওর হাত-টাত কাঁপত, ঘাম হত, মুখ হয়ে যেত লাল। বড্ড অপরাধবোধে ভুগত সে। স্বাভাবিক হতে পারত না। একবার তো এক গার্ডেন পার্টিতে সরিতা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? তাহলে চলো, লেট আস লিভ।

তার জবাবে, ভয় পেয়েই বোধহয়, বুধাদিত্য বিকট গলায় বলে উঠেছিল, না, না। আমি ঠিক আছি তো! আমি তো ঠিকই আছি!

এত জোরগলায় বলেছিল বলে পার্টির সকলের নজর গেল ওর দিকে। সবাই লক্ষ করেছিল, বুধাদিত্যর আচরণ স্বাভাবিক নয়। একটা

কিছু হয়েছে। এক ডাক্তার বন্ধু সুব্রত কাছে এসে বলেছিল, কিছু হয়নি হয়তো, তবু প্রেশারটা চেক করাস। তোর খুব ঘাম হচ্ছে।

সব কিছুরই একটা ক্যালকুলেশন আছে। যেমন সময়। নন্দিনী কখনও বুধাদিত্যর সঙ্গে রাত কাটানোর চেষ্টা করেনি। কাটালে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। নিরাপদ সময় ছিল দুপুর, বিকেল, সন্ধে বা এমনকী সকালও। দ্বিতীয় ক্যালকুলেশন হল জায়গা। একটা বিশেষ জায়গায় বারবার যাওয়া ঠিক নয়। তারা কলকাতা এবং আশেপাশে অনেকগুলো গেস্ট হাউস ব্যবহার করেছে। এমনকী ওয়াটগঞ্জের রেড লাইট এলাকায় সেক্স ওয়ার্কারের ঘরও ভাড়া নিয়েছে।

একদিন বুধাদিত্য খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলল, সরিতা বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছে।

কী করে বুঝলে?

ওর এক জামাইবাবু আছে, খুব উয়োম্যানাইজ়ার। তা নিয়ে ওদের পরিবারে খুব অশান্তি। কাল রাতে বলছিল, ওর জামাইবাবু নাকি সম্প্রতি একজন টিন-এজারের সঙ্গে ইনভলভ্ড। খুব রেগে আছে সরিতা। ঘটনাটা বলবার পরই হঠাৎ আমার চোখের দিকে সটান চেয়ে বলল, সব পুরুষই সমান।

খুব হেসেছিল নন্দিনী।— তোমাকে বোকা কি আর সাধে বলি? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ওরকম কত কথা হয়।

সরিতা এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যে, মনে হল ও আমার চোখে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছে।

তোমাকে একটা কথা বলব?

কী কথা?

আই অ্যাম ইন লাভ উইথ ইউ।

সে তো জানি নন্দিনী।

এখন আমার সিরিয়াস একটা প্রশ্ন আছে বুধো! আর ইউ অলসো ইন লাভ উইথ মি?

নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! এটা আবার কী প্রশ্ন?

তাহলে আমরা একটা কাজ তো সাহসের সঙ্গেই করতে পারি।

ডিভোর্স?

নয় কেন?

একটু ভাবল বুধাদিত্য। বিমর্ষ মুখে বলল, কী জানো, আমাদের ফ্যামিলি খুব কনজ়ারভেটিভ। সরিতাকে পছন্দ করে এনেছিলেন আমার বাবা। ডিভোর্স হলে বাবা খুব আঘাত পাবেন। আর সত্যি কথা বলতে কী, সরিতা ইজ় এ নাইস উয়োম্যান।

নন্দিনী ফোঁস করে ছোবল তুলল, আর আমি?

তুমি! তুমি একদম অন্যরকম। সরিতা অর্ডিনারি। তোমার পাশে দাঁড়াতেই পারে না। ওর চার্ম বা অ্যাট্রাকশন কম। শি ইজ় গুড ইন হার ওন ওয়ে। আর ইউ জেলাস?

তোমার বউয়ের প্রশংসা শুনতে আমার ভাল লাগার কথা নয়। বিশেষ করে তোমার মুখে।

প্রশংসা! না ঠিক প্রশংসা এটা নয়। মেয়েটা ভাল, এটা খুব নিরীহ, নিস্তেজ একটা স্টেটমেন্ট। তার বেশি কিছু নয়।

ঠিক আছে। সরিতাকে আজ আমরা যথেষ্ট সময় দিয়েছি। ওর কথা থাক।

থাক।

কিন্তু তুমি ভয় পেয়ো না। অগাধ জলে পড়োনি। তেমন অশান্তি করলে ডিভোর্স হাতেই রয়েছে।

পাহাড়ে চড়ার নেশা বুধাদিত্যর সাংঘাতিক। নন্দিনীর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার ছয়-সাত মাস বাদে ফের পাহাড়ে গেল বুধাদিত্য। লোৎসে না কি অন্য কোনও পাহাড় কে জানে? এ নিয়ে বেশি কথা বলত না বুধাদিত্য। তার সাফ কথা, সমতলের বাসিন্দাদের পাহাড়ে চড়ার গল্প শুনিয়ে লাভ নেই।

কিন্তু খুব ভয় হয়েছিল নন্দিনীর। ওর কিছু হবে না তো! বুধাদিত্য

তো ট্রেকার নয়, মাউন্টেনিয়ার। রীতিমতো ট্রেন্ড। সে উঠলে উঠবে দুর্গম পাহাড়ে। রিস্ক তো থাকবেই।

প্রথম কয়েকদিন মোবাইল ফোনে যোগাযোগ হয়েছিল। তারপর বেসক্যাম্পে গিয়ে এক-আধবার। একদিন বলল, ভোররাতে আমরা চড়াই শুরু করছি।

বুক খুব ধকধক করছিল নন্দিনীর। মানুষটিকে সে যে কী গভীরভাবে ভালবাসে তা সেদিন বুঝল। বড্ড আলুনি লাগল স্বামীর সেই রাতের সহবাস। তারপর বারান্দায় গিয়ে গভীর রাতে সে খুব কাঁদল। যদি বুধাদিত্যর কিছু হয় সে কি বাঁচবে?

পরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল নন্দিনী। কোনও খবর এল না। দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল, তখন বাধ্য হয়ে সে সরিতাকে ফোন করল।

সরিতা, বুধাদিত্যবাবুর খবর কী? শুনেছিলাম আজ সামিট ট্রাই করবেন!

সরিতা করুণ গলায় বলল, খবর ভাল নয় নন্দিনী। ওয়েদার খারাপ থাকায় ওরা অনেকটা উঠেও নেমে এসেছে।

স্যাড। উনি খবর দিলেন বুঝি?

হ্যাঁ। একটু আগে স্যাটেলাইট ফোনে জানাল। কাল নাকি আবার চেষ্টা করবে। যা টেনশনে আছি বলার নয়। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর কলিং।

উনি তো আমাদেরও বন্ধু, টেনশন তো আমাদেরও হয়।

সে তো ঠিক কথাই ভাই। কিন্তু আমাদের টেনশন তুমি ঠিক বুঝবে না। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর-ননদ সবাই ভীষণ অস্থির। তোমাকে বড্ড হিংসে হয়। তোমার বরটি দেখো তো, কেমন নিরীহ ওকালতি করে দিব্যি ভাল আছে! আমারটার মতো একটা ছন্নছাড়া পাগল তো জোটেনি তোমার কপালে! যতবার পাহাড়ে যায় ততবার আমার ওজন কমে অর্ধেক হয়।

নন্দিনী মনে মনে বলেছিল, ওই পাগল কি আর তোমার আছে সরিতা? ও এখন আমার। ওর সব কিছু আমার। মুখে বলল, সে তো হওয়ারই কথা সরিতা। কিন্তু ভেবো না, উনি ঠিক সামিটে উঠবেন এবং ফিরেও আসবেন। তারপর আমরা সেলিব্রেট করব।

সেলিব্রেট! না না, সেলিব্রেট করার কিছু নেই। এভারেস্টে তো আর উঠছে না, ভালয় ভালয় ফিরে আসুক, এ ছাড়া আর কিছুই চাই না।

নির্লজ্জের মতো পরের দিনও ফের ফোন করেছিল নন্দিনী। কারণ বুধাদিত্য তাকে কোনও খবর দেয়নি। কিন্তু তার খুব প্রত্যাশা ছিল যে, বুধাদিত্য তাকে একবার অন্তত জানাবে।

সরিতার গলাটা এবার একটু অন্যরকম শোনাল, তুমি যে এত ইন্টারেস্ট নিচ্ছ এতে ভীষণ খুশি হলাম। কিন্তু ওরা ফাইনালি ফিরেই আসছে। ওয়েদার অফিস থেকে জানিয়েছে যে, আবহাওয়া আরও খারাপ হবে।

সে কি একটু বেশি আগ্রহ দেখিয়ে ফেলেছে?

সমস্ত শরীর আর সবটুকু মন নিয়ে অপেক্ষা করছিল নন্দিনী। বুধাদিত্য ফিরল। কিন্তু কার কাছে ফিরল? তার কাছে? না সরিতার কাছে? ফেরার পর তিনদিন ফোন করল না, কোনও খবরও দিল না। যেন নন্দিনী বলে কেউ নেই। তিনদিন পার করে চারদিনের দিন একটা ছোট্ট মেসেজ এল মোবাইলে, আমি খুব ক্লান্ত। মাপ করে দিয়ো।

সকালে গোপাল যখন স্নান করতে গেছে তখন তার মোবাইল থেকে নন্দিনী বুধাদিত্যর নম্বরে ফোন করল।

বুধাদিত্যর উল্লসিত গলা শোনা গেল, বল রে গোপাল, কেমন আছিস!

তোমার কী হয়েছে বলো তো! ফোন করোনি, দেখাও করোনি! আমি কি কেউ নই?

তার গলা শুনে বুধাদিত্য বোধহয় ঘাবড়ে গেল। একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, অসুবিধে আছে। প্লিজ়!

তুমি আমাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছ বুধো।

বললাম তো, অসুবিধে আছে। পরে কথা হবে।

পরে? মানে কত পরে? আজ, না কাল, না পাঁচ বছর পর?

একটু সময় দাও। এখনই নয়। একটা বড় ধকল গেল তো!

পাহাড়ে গেলে কি লোক পালটে যায়?

বুধাদিত্য ফের কিছুক্ষণ চুপ। তারপর ক্ষীণ গলায় বলল, কখনও কখনও হয়তো যায়।

তাই বুঝি? তুমি কতটা পালটে গেছ সেটা আমি দেখতে চাই। নিজের চোখে।

প্লিজ়! আমি মাত্র দু'-চারদিন সময় চাইছি।

বুধাদিত্য আমার কিন্তু অনেক কিছু জানার আছে। যে তোমাকে সর্বস্ব দিয়েছে তার কাছে একটা জবাবদিহিও করার আছে তোমার।

ফোনটা কেটে কল রেকর্ডটা ডিলিট করে দিল নন্দিনী।

তারপর একা একা ফুঁসতে লাগল। কিন্তু ছোবল মারার মতো হাতের কাছে কেউ তো নেই।

কারও পাহাড়ে চড়ে আনন্দ, কারও বা আইনশাস্ত্রের জটিল-কুটিল পথে বিচরণ করে আনন্দ। কার আনন্দ যে কোথায় তার হদিশ পায় না নন্দিনী। বিয়ের পর কয়েক মাস তার সঙ্গে গোপালের সম্পর্কটা ছিল খুব হট। তাদের দু'বছরের প্রেম এবং তারপর বাধাহীন বিয়ে। মুশকিলটা দেখা দিল যখন গোপাল কয়েকটা জটিল কেস-এ মক্কেলকে জিতিয়ে দিয়ে বেশ একটা নাম ফেলে দিল। যথারীতি টিভির নানা চ্যানেলের অনুষ্ঠানেও তাকে ডাকা হতে লাগল। তারপরই মক্কেল, মামলা আর টাকার স্রোতে ভেসে গোপাল অনেকটা দূরে সরে গেল নন্দিনীর কাছ থেকে।

দূরত্বটা এখনও আছে। থেকেই যাবে। বেচারা গোপালেরও তো কিছু করার নেই। শুধু টাকা রোজগারের নেশা গোপালের নয়। আসলে

সে আইনের কূটকচালির ভেতরে গভীর আনন্দ খুঁজে পায়। এখনও অনেক রাত অবধি বইপত্র ঘাঁটে, নোট নেয়। আইনশাস্ত্র নিয়েই তন্ময় থাকে। এত কাছে থেকেও গোপাল তাকে ভুলে গেছে। সেও ভুলে গেছে গোপালকে।

কতটা ভুলে গেছে তার ঠিক আন্দাজ ছিল না নন্দিতার।

মধ্য কলকাতার একটা মল-এ সেদিন দুপুরে হঠাৎ এক ভদ্রলোক কাছাকাছি এসে বলল, আপনি নন্দিনী না?

হ্যাঁ।

আমি সুব্রত ঘোষ। শুনলাম গোপাল নাকি জাস্টিস হওয়ার অফার রিফিউজ় করেছে!

কয়েক সেকেন্ড নন্দিনী মনেই করতে পারল না গোপাল লোকটা কে! গোপাল! গোপাল! বলে মনে মনে কয়েকবার আউড়ে তারপর হঠাৎ ভারী লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে বলল, হ্যাঁ, তাই তো শুনেছি।

আসলে সেও জানত না যে, গোপাল জাস্টিস হওয়ার অফার রিফিউজ় করেছে। গোপাল তাকে বলেনি।

খুব অপমান বোধ হলে কি জ্বর আসে? নন্দিনীর তো আসছে। শ্বাস গরম, গায়ে শীত-শীত, চোখে জ্বালা, তেষ্টা, মাথা ঝিমঝিম। অথচ থার্মোমিটার দিলে জ্বর উঠছে না। না উঠুক, তবু জ্বরে তার শরীর বয়ে আছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আজকাল সে ভীষণ ঘেন্নার সঙ্গে নিজেকে দেখে। সেই সুন্দরী নন্দিনী কোথায়? এ তো এক উলোঝুলো পেত্নি! কেউ দু'বার তাকাবে তার দিকে?

দশটা অসহনীয় দিন খুব ধীরে ধীরে, যেন এক বছর সময় নিয়ে কেটে গেল। তারপর দুপুরবেলা নন্দিনী ফোন করল বুধাদিত্যকে।

তুমি এখন কোথায়?

শো-রুমে।

খুব ব্যস্ত?

হ্যাঁ। বিয়ের মরশুম চলছে।

আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

একটু অসুবিধে আছে। এখনই সম্ভব নয়।

কীসের অসুবিধে?

আছে। ফোনে বলা যাবে না।

তুমি কি আর সম্পর্ক রাখতে চাও না?

প্লিজ! এখন ওসব কথা থাক।

আমার জানা দরকার বুধাদিত্য।

বলছি তো, ফোনে কথা বলা যাবে না।

তাহলে মুখোমুখি হয়ে বলো, চোখে চোখ রেখে বলো।

তার জন্য সময় লাগবে।

সময়ের মানে জানো? আমার কাছে এক-একটা মিনিট কাটছে এক ঘণ্টা সময় নিয়ে। মনে হচ্ছে, একদিনেই আমার এক বছর করে বয়স বেড়ে যাচ্ছে। আমার টেনশনে টেনশনে শরীর খারাপ। রোজ জ্বর হয়। মাথা ধরে থাকে। চোখে জ্বালা। সব সময়ে কান্না পাচ্ছে। আমি কী করব বুধাদিত্য?

বুধাদিত্য চুপ।

শুনতে পাচ্ছ বুধাদিত্য?

পাচ্ছি। আমিও ভাল নেই।

কেন ভাল নেই?

আমার কিছু ভাল লাগছে না।

কাকে ভাল লাগছে না? আমাকে?

তোমার কথা হচ্ছে না। আমার মন ভাল নেই।

কেন তোমার মন ভাল নেই তা আমাকে বলতে চাও না?

কী করে বলব, আমিই জানি না কেন মন ভাল নেই।

তাহলে আমি কী করব বলে দাও।

তুমি কী করবে! তুমি কী করবে তা আমি কী করে বলি!

আমারও যে মন ভাল নেই বুধাদিত্য!

বুধাদিত্য চুপ।

তোমার কিছু বলার নেই?

বুধাদিত্য বলল, না।

ফোন বন্ধ করে নন্দিনী অনেকক্ষণ শূন্য মনে বসে রইল। শরীর যেন ভারশূন্য। মাথা বড্ড ফাঁকা। সে যেন কিছুক্ষণের জন্য 'নেই' হয়ে গেল।

সে জানে, কাজটা উচিত হবে না। তবু কিছু তো তাকে করতেই হবে। নইলে সে এই অসহনীয় ব্যাপারটাকে সহ্য করবে কী করে? সে ফের ফোনটা তুলে সরিতাকে ধরল।

কেমন আছ সরিতা?

ওমা! নন্দিনী! কেন, ভালই তো আছি! তোমার কী খবর?

ভাল। শুনলাম বুধাদিত্যবাবুর শরীর ভাল নেই!

কে বলল তোমাকে! শরীর তো ঠিকই আছে। কে এসব রটায় বলো তো!

কে যেন বলছিল!

তাহলে তো ওকেই ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারতে? শুনেছি তোমাদের ফোনে ফোনে অনেক কথা হয়!

মাঝে মাঝে হয়। উনি বোধহয় এখন ব্যস্ত আছেন, তাই—

কিছুই তেমন ব্যস্ত নয়।

তোমাকে ফোন করলাম বলে বিরক্ত হওনি তো সরিতা?

তা কেন? ফোন করতেই পারো। তোমার কি ওর সঙ্গে কোনও দরকার আছে?

ছিল একটু। আমার আংটির একটা পাথর পড়ে গেছে। সেটা সেট করতে হবে।

সরিতা একটু যেন ঝামরে উঠে বলল, এই সামান্য কাজের জন্য ওকে কেন? পাড়ার স্যাকরাই তো পারে।

নন্দিনী ফোন রেখে দিল।

সকালের ফ্লাইটে গোপাল গৌহাটি গেল। আর বেলা এগারোটা নাগাদ যখন বেরোবে বলে তৈরি হচ্ছিল নন্দিনী, তখনই ডোরবেলের শব্দ। কাজের মেয়ে বাসবী দরজা খুলে বলল, বউদি, মুহুরিবাবু এসেছে।

মুহুরিবাবু শ্যামাপদ মাঝবয়সি লোক। রোগাভোগা। সবসময়ে জড়োসড়ো ভাব।

কী ব্যাপার মুহুরিবাবু?

স্যার এটা আপনাকে দিতে বলে গেছেন।

মুহুরিবাবুর হাতে একটা লম্বা খাকি রঙের মুখ-আঁটা খাম।

কী এটা?

স্যার আপনার হাতে দিতে বলেছেন।

নন্দিনী ভ্রু কুঁচকে বলল, সকালেই তো দেখা হল, কিছু বলল না তো! কী আছে এতে?

আজ্ঞে, ঠিক জানি না ম্যাডাম।

ঠিক আছে। আপনি আসুন।

মুহুরিবাবু একটা নমস্কার করে চলে গেলেন।

খামের ওপর টাইপ করা তার নাম। রহস্যময়। খামটা খুলে নন্দিনী দেখে তাতে কয়েকপাতা কমপিউটার প্রিন্ট-আউট। 'সন্ধানী' নামে কোনও একটা ডিটেকটিভ এজেন্সির লেটারহেডে ছাপা।

বিছানায় বসে প্রথম পাতাটা পড়তে গিয়েই ধড়াস করে উঠল তার বুক। তিন মাস আগেকার একটা তারিখের নীচে ইংরিজিতে লেখা, বি এবং এন আজ রায়চকের অমুক হোটেলে বেলা দেড়টায় ছত্রিশ নম্বর ঘরটি বুক করে। তারা সেখানে তিন ঘণ্টা ছিল। সাদা রঙের গাড়ি ইন্ডিকা নম্বর অমুক। বিকেল সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটা পনেরো পর্যন্ত তারা নদীর ধারে বসে ছিল। এরপর তারা রাস্তার ধারের একটা ছোট্ট দোকানে ভাঁড়ে চা খায়। তারপর সোজা কলকাতায় ফিরে যায়।

গাড়ি নিজেই চালাচ্ছিল বি। সঙ্গে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি ছিল না।

পাঁচদিন পরের তারিখের এন্ট্রি। বাগুইহাটির অমুক গেস্ট হাউসে বি এবং এনকে বেলা তিনটেয় ঢুকতে দেখা গেছে। গাড়ি সাদা ইন্ডিকা, একই নম্বর। তারা একটা স্যুট বুক করে। দু'নম্বর। দু'ঘণ্টা থাকে। তারপর দু'জনেই ইন্ডিকায় এয়ারপোর্ট যায়। বি সেদিন সন্ধে সাতটা পনেরোর দিল্লি ফ্লাইট ধরে। এন ইন্ডিকা নিয়ে একাই ফিরে আসে। এবার ড্রাইভার ছিল।

এরকম একের পর এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঠিকঠাক বিবরণ। দু'জনের পরনে কী পোশাক ছিল তারও হুবহু বর্ণনা আছে।

খানিকক্ষণ বজ্রাহতের মতো বসে রইল নন্দিনী। ভয়, বিস্ময় আর প্রচণ্ড অস্বস্তিতে। গোপাল তার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছে? তাও তিনমাস আগে! অথচ সে বা বুধাদিত্য ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তো।

গলা শুকিয়ে আসছিল বলে সে অনেকটা জল খেল। অপ্রত্যাশিত বটে, কিন্তু জানাজানি তো একদিন হতই। কিন্তু ঝপ করে যে পরদা সরে গিয়ে দু'জনে বেআব্রু হয়ে যাবে এটা আন্দাজ করতে পারেনি সে।

ঘড়ি দেখে গোপালের গৌহাটি পৌঁছনোর সময়টা আন্দাজ করল সে। মনে হল আধঘণ্টা আগে পৌঁছে গেছে। বুকটা একটু কাঁপছিল নন্দিনীর।

গোপালের খুব নির্বিকার গলা পাওয়া গেল।— হ্যাঁ নন্দিনী বলো।

তুমি আমাকে যে-রিপোর্টটা পাঠিয়েছ তা পেলাম।

ঠিক আছে। ওটা রেখে দাও।

ডিটেকটিভ লাগানোর কি খুব দরকার ছিল?

এখন আমি লোকজনের মধ্যে আছি। একটু পরেই মিটিং। ফিরে এসে কথা হবে।

তুমি কাল কখন ফিরবে?

সন্ধের ফ্লাইটে।

ঠিক আছে।

বউ পরপুরুষে আসক্ত হলে পুরুষ মানুষ নানারকম ভাবে রি-অ্যাক্ট করতে পারে। আদিম মানুষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তারক্তি কিংবা খুন, নয়তো প্রচণ্ড চেঁচামেচি, নয়তো কান্নাকাটি, নয়তো মহান হয়ে ডিভোর্স দিয়ে দেওয়া। গোপাল কোনটা করবে এটা আঁচ করতে পারছিল না নন্দিনী। দু'বছরের প্রেম এবং সাড়ে তিন বছরের বিয়ের পরও, তার মনে হল, গোপাল সম্পর্কে তার ধারণা বা জ্ঞানগম্যি খুব বেশি নয়।

বাঁধা রীতির গণ্ডি পেরোলেই বিপদ। কাজেই একটু উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল তাকে। আগের মতো হলে বুধাদিত্যকে জানিয়ে দিত। একটা সহায় থাকত তার। এক-আধবার ফোন করার কথা ভেবেও করল না। থাক। তার দায় সে একাই সামলাবে।

পরদিন বেশ একটু রাতের দিকে ফিরল গোপাল। শাওয়ারে গেল। রাতের খাবার খেল দু'জনে। কোনও কথা হল না। কাজের মেয়েটা রয়েছে।

শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করার পর নন্দিনী গোপালের মুখোমুখি হল, কী বলবে বলো।

গোপালের মুখে রাগ, ঘৃণা, উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। একটু গম্ভীর, এই যা। খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, একটাই অনুরোধ, বুধোকে ছেড়ে দাও। বেচারা কষ্ট পাচ্ছে।

নন্দিনী চোখ নামিয়ে বলল, আমি তো কাউকে ধরে রাখিনি।

গোপাল একটু ভাবালু গলায় বলল, ক্লাস ফাইভ থেকে আমরা বন্ধু। ওকে আমি খুব গভীরভাবে চিনি নন্দিনী। ও এরকম নয়। ও মরালিস্ট, ভীষণ সৎ, একটু প্রাচীনপন্থী। পিউরিটান বলতে যা বোঝায়।

তার মানে, দোষটা কি শুধু আমার? ওর নয়? শুধু ও ভাল, আর আমিই খারাপ?

সেই বিচার করার সাধ্য আমার নেই। শুধু তোমাকে বলি, মাস

দেড়েক আগে বুধোই আমাকে একদিন তোমাদের রিলেশনের কথা বলে দেয়।

নন্দিনী এই কথায় যেন চাবুক খেয়ে চমকে উঠল, তার মানে?

আমাকে বলল, তুই তোর বউকে আর-একটু সঙ্গ দে গোপাল। বেচারা একা একা বোর হয়। আমি বললাম, হঠাৎ এ কথা কেন? প্রথমে তেমন কিছু বলছিল না, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত করছিল মাত্র। আমি বুঝতে পারছিলাম, সামথিং ইজ রং। চেপে ধরতেই সব কনফেস করল। বলল, আমাকে বাঁচা। আমি এই রিলেশন চাইছি না।

নন্দিনী ধরা গলায় বলল, তাই তুমি আমাদের পেছনে স্পাই লাগিয়েছিলে?

গোপাল অবাক হয়ে বলে, আমি! আমি কেন লাগাব? স্পাই লাগিয়েছিল বুধাদিত্য নিজেই। আমার হাতে এভিডেন্স তুলে দিয়ে ও পাহাড়ে চলে যায়।

নন্দিনী অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে গোপালের দিকে চেয়ে বলে, এটা হতে পারে না। বিশ্বাস করি না।

সে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু বুধাদিত্য স্বীকার করবে।

তীব্র রাগ আর ঘৃণায় নন্দিনীর ভেতরটায় যেন এক মন্থন শুরু হল। মনে মনে বলল, আই মাস্ট কিল ইউ।

চার

বাজার থেকে ঘরে ঢুকেই সুমিত দেখল, বাইরের ঘরে বাবার সোফাটাতেই মাখনকাকা বসে আছে। পরনে ময়লা ধুতি, গায়ে একটা হাতা গোটানো গেরুয়া হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি। মাথার চুল লম্বা হয়ে ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে, কপালে একটা তিলক গোছের কিছু, চোখ নিমীলিত, মুখে পান। মাখনকাকার গায়ের রং কালো, দাঁত উঁচু এবং রসকষহীন মুখশ্রী। সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে দু'খানা পায়ের পাতা। যারা চটি পরে রাজ্যি ঘুরে বেড়ায় তাদেরই পায়ের এমন এবড়ো-খেবড়ো, ফাটা, কড়া পড়া এবং ধুলোটে চেহারা হয়। যেখানে পা ফেলবে সেখানেই ধুলোটে ছাপ পড়ে যাবে। সোফাসেটের সামনে পাতা দামি ছোট কার্পেটটার ওপরে মাখনকাকার পায়ের ছাপটা লক্ষ করতে ভুল হল না সুমিতের। বাইরে পাপোশের ওপর ছাড়া একজোড়া মলিন নীল স্ট্র্যাপের জীর্ণ হাওয়াই চটি দেখেই মেজাজটা খাট্টা হয়ে ছিল সুমিতের।

তাকে দেখেই মাখনকাকা বলল, তোর জন্যই বসে আছি।

এসব লোকের সঙ্গে তার পারতপক্ষে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। বাবার এরকম সন্দেহজনক বন্ধু বেশ কয়েকজন আছে। ভদ্রলোক আর ফেরেব্বাজদের মাঝামাঝি জায়গায় এদের অবস্থান। সুমিত একবার শুধু ভ্রুক্ষেপ করে একটা গম্ভীর 'হুঁ' দিয়ে ভেতরের দিকে গেল। দুই বেডরুমে দু'টি নারী নিজের নিজের কমপিউটার এবং ল্যাপটপে মগ্ন হয়ে আছে। বাহ্যচেতনা নেই।

রান্নাঘরে একা সুমিতা। মুঠোভর কোমর, ছিপছিপে শরীর আর অদ্ভুত সুন্দর মুখশ্রীর মেয়েটাকে কাজের মেয়ে হিসেবে মানায় না। সিনেমা-সিরিয়ালে চান্স পেতে পারত।

তাকে দেখলেই সুমিতার মুখ যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এটা খুব সন্তর্পণে, সরাসরি না তাকিয়েও লক্ষ করেছে সুমিত। ব্যাপারটা তার মন্দ লাগে না। পুরুষ স্বভাবতই দুর্বলচিত্ত। তাই সুমিত আজকাল সাবধান হয়েছে। একটু গম্ভীর থাকে। বাজারটা নামিয়ে রাখতেই ভারী মিষ্টি গলায় সুমিতা বলে, দাদা, যে-ভদ্রলোক এসেছেন তাকে কি চা করে দেব?

সুমিত একটু মুশকিলে পড়ে যায়। ফেরেব্বাজ হোক আর যাই হোক, লোকটা বাবার বন্ধু এবং এ বাড়িতে না হোক অন্তত বিশ বছরের যাতায়াত। এক কাপ চা হয়তো লোকটার পাওনা হয়। সে বলল, কী দরকারে এসেছে দেখে নিই। যদি আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে তাহলে চা খাবেন কি না তা গিয়ে জিজ্ঞেস কোরো।

ঠিক আছে দাদা।

মাখনকাকা একই সঙ্গে একজন দালাল, জ্যোতিষী, জুয়াড়ি এবং মাতাল। এই লোকটাকেই তার বাবা রজতশুভ্র এক কথায় চল্লিশ হাজার টাকা ধার দিয়ে ফেলেছিলেন। তাও গোপনে। বিভিন্ন লোককে ধার দিয়ে রজতশুভ্র ঠকেছেন কম নয়। এই ভালমানুষিকে লোকে বলে আহাম্মকি। দেদার সঞ্চিত টাকা থাকলেও না হয় হত। রজতশুভ্রর চার-পাঁচ লক্ষের বেশি টাকাও নেই। বলতে গেলে তাঁর শেষ সম্বল। এই নিয়েই চূড়ান্ত অশান্তি হয়েছিল একদিন। সুমিত আর রুমি দু'জনেই রেগে গিয়েছিল খুব। মুখ ফসকে কিছু অপমানসূচক কথাও বেরিয়ে যায়।

আবার মাখনকাকা খুব ফ্যালনা লোকও নয়। শ্যামবাজারে এঁর তিনতলা পৈতৃক বাড়ি। একটা দৈনিক কাগজে ভৃগুনন্দন ছদ্মনামে সাপ্তাহিক রাশিফল লেখেন। নির্ভুল ইংরিজিতে দরখাস্ত লিখতে পারেন। শেয়ারবাজার সম্পর্কে টনটনে জ্ঞান। এইসব লোককে সমাজের কোন ক্যাটাগরিতে ফেলা যায়, সেটাই একটা সমস্যা। তবে সুমিতের শালা গোপাল এঁর পাল্লায় পড়ে জ্যোতিষী শিখেছিল। শেষে

জ্যোতিষী নিয়ে এমন মেতে উঠল যে এল এল বি পরীক্ষা লাটে ওঠার জোগাড়।

বিরক্তি চেপে লোকটার মুখোমুখি বসতে হল সুমিতকে।

রাজুদার কোনও খবর পেলি?

না।

কিছুক্ষণ চুপ করে ছাদের দিকে চেয়ে মাখনকাকা বললেন, আমার মনে হয় রাজুদা বেঁচেই আছেন। ওঁর কুষ্ঠি আমি দেখেছি। লম্বা আয়ু।

কথাটাকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনও মানে হয় না। সুমিত শুধু বলল, হুঁ।

আরও কিছুক্ষণ মুখের পান চিবোলেন মাখনকাকা। তারপর একটু উসখুস করে জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কোনও গোপন পকেট থেকে একতাড়া হাজার টাকার নোট বের করে আনলেন। তারপর বললেন, রাজুদার কাছ থেকে দেড় বছর আগে টাকাটা ধার নিয়েছিলাম। মোট চল্লিশ হাজার। রাজুদার সঙ্গে সুদ নিয়ে কোনও কথা হয়নি। তবু আমি ফিফটিন পারসেন্ট রেটে দেড় বছরের সুদও যোগ করে দিয়েছি। গুনে নে।

সুমিত এতটাই অবাক হয়েছিল যে, টাকাটা হাত বাড়িয়ে নিতেও যেন ভুলে গিয়েছিল। একটু থতমত খেয়ে বলল, টাকাটা শোধ দিচ্ছেন?

মাখনকাকা উদাস গলায় বলেন, সব কিছু কি আর শোধ দেওয়া যায় রে? যে-বিপদে পড়েছিলাম, তাতে টাকাটা না পেলে আমাকে পথে বসতে হত। ওই কাইন্ডনেস কি শোধ দেওয়া যায়! এই চল্লিশ হাজার তখন বিপদে চল্লিশ লাখের কাজ করেছিল। বুঝলি? টাকাটা গুনে নে।

এখানে কত আছে?

ঊনপঞ্চাশ হাজার।

আমার বাবা কি টাকা ধার দিয়ে সুদ নিতেন?

যতদূর জানি, না। তবে নেওয়াই উচিত। এতগুলো টাকা ফিক্সড ডিপোজিটে রাখলে বা শেয়ারে খাটালে কত বেড়ে যেত বল তো! তাছাড়া আরও একটা কথা আছে, টাকার ডিভ্যালুয়েশনও তো হচ্ছে। তখনকার চল্লিশ এখনকার পঞ্চাশের সমানই হবে।

তা বলে ফিফটিন পারসেন্ট?

প্রাইভেট মানি-লেন্ডারদের রেট আরও অনেক বেশি।

ঠিক এই সময়ে সুমিতা ঘরে এসে মাখনকাকাকে বলল, আপনাকে একটু চা করে দিই?

চা! তা দাও একটু।

চিনি দেব?

হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনি দুধ সব দেবে। রেগুলার চা, আমি লিকার চা দু'চোখে দেখতে পারি না।

চা খেয়ে মাখনকাকা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ অভিভূতের মতো বসে রইল সুমিত। তার ডান হাতের মুঠোয় ঊনপঞ্চাশ হাজার টাকা। মাত্র এই সামান্য টাকার জন্য বাবার ওপর সেদিন অত রেগে যাওয়া কি তার উচিত হয়েছিল? তার গালে একটা চড় কষিয়ে, তার আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমাণ করে মাখনকাকা যে সুদ সমেত টাকাটা ফেরত দিয়ে যাবে, এটা জানলে সে কি করত ওই কাণ্ড?

মিমি আচমকা ঘরে এসে তাকে দেখে থমকে গেল, বাবাই, তুমি এমন স্ট্যাচু হয়ে বসে আছ কেন?

টাকাটা মেয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সুমিত বলল, এটা কাল বাবার অ্যাকাউন্টে জমা করে দিস।

কীসের টাকা এটা?

মাখনকাকা শোধ দিয়ে গেল।

সেই টাকা? মাই গড!

মিমি টাকাটা নিল, যত্ন করে গুনল, তারপর নিজের ঘরে চলে গেল।

দুপুরের দিকে বৈদূর্যর ফোন এল, স্যার আমি বৈদূর্য!

তুমি এখন কোথায় বৈদূর্য?

আপনি কি ফালাকাটা চেনেন স্যার?

চিনি।

ফ্যান্টাস্টিক জায়গা স্যার। নর্থ বেঙ্গলের সব জায়গাই এত সুন্দর যে, ভাবা যায় না।

বৈদূর্য, তুমি কি ওখানে সাইট সিয়িং-এ গেছ?

না স্যার। তবে ফ্রিঞ্জ বেনিফিট হিসেবে সেটাও হয়ে যাচ্ছে।

ফালাকাটায় তোমার কীসের দরকার?

আমার কোনও দরকার নেই স্যার। আমি নীলা দিদিমণির সঙ্গে এসেছি। এখানে ওঁর এক কাকা থাকেন। দারুণ মানুষ।

বিরক্ত সুমিত বলে, তুমি গেছ একটা কাজে। তার কতদূর?

স্যার, আপনি কি নীলা দিদিমণির সঙ্গে একটু কথা বলবেন?

নীলা কি কথা বলতে চায়?

হ্যাঁ স্যার। দিচ্ছি—

নীলার ক্ষীণ এবং লাজুক গলাটা এল একটু পরে।— কেমন আছ?

ভাল, তুমি কেমন? আদিত্যর খবরটা শুনে খারাপ লাগল। ক্র্যাশটা কবে হয়েছিল বলো তো!

দু'বছর আগে।

খবরটা জানতাম না। তোমাদের সঙ্গে কতকাল যোগাযোগ নেই!

আমাদের ভুলে যাওনি তো!

না। ভুলব কেন? এই তো তোমার গলা শুনে হু হু করে কত পুরনো কথা মনে আসছে।

আমার তো এখন পুরনো কথাই সম্বল। বসে বসে সেই কত কালের কথা ভাবি।

তা কেন নীলা? তোমার বয়স তো ছত্রিশ-সাঁইত্রিশের বেশি নয়।

একটা ঘটনা ঘটে গেছে বলেই কি জীবন শেষ হয়ে গেছে? নতুন করে শুরুও তো করা যায়!

আমার তো মনে হয়, সব শেষ। এখন শুধু ছেলেটাকে মানুষ করা। ওকে নিয়েই কাটিয়ে দেব বাকি জীবনটা।

পুরনো আমলে বৈধব্যের ওইরকমই সংজ্ঞা ছিল। কিন্তু দিনকাল পালটেছে, দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেছে। মৃত স্বামীর স্মৃতি আঁকড়ে থাকা কোনও কাজের কথা নয়।

তুমি তো জানো না, আমার বিবাহিত জীবনও খুব সুখের ছিল না। আদিত্যর সঙ্গে আমার তেমন বনিবনাও হত না। ও সবসময়ে চাইত হই-হুল্লোড়, সেলিব্রেশন, মহিলা-সঙ্গ আর মাতলামি। কাজেই আদিত্যর স্মৃতি আঁকড়ে ধরে আমি বেঁচে নেই। কিন্তু আমার ছেলের বয়স সাত বছর। আমি এমন কিছু করতে পারি না, যা ওর চোখে দৃষ্টিকটু লাগবে।

তোমার ছেলে এ যুগের মানুষ নীলা। ঠিক মেনে নেবে।

ভয় করে। বড্ড ভয় করে। আমি হয়তো পারব না।

তুমি তো বরাবরই ভিতুর ডিম। সাইকেলের রডে চাপিয়ে তোমাকে রাসমেলায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম একবার। তুমি রাজি হওনি।

মনে আছে।

সেদিন বৈদূর্য আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি তোমাকে বিয়ে করিনি কেন। ওকে একটা ধমক দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন ভাবি, তোমাকে বিয়ে করলে কী ভালই হত। দু'জনে একসঙ্গে পাশাপাশি বড় হয়েছি। কত খুনসুটি, ঝগড়া আর ভাব। মনে পড়ে?

পড়বে না? সেইসব স্মৃতি নিয়েই তো বেঁচে আছি। অনেকদিন কুচবিহারে আসোনি, এবার একবার এসো।

খুব ইচ্ছে করে। দেখি...

তোমার বোধহয় একবার আসা খুব দরকার।

কেন বলো তো?

মেসোমশাই বোধহয় ফালাকাটার কাছেই বেশ কিছুটা জমি কিনে রেখেছিলেন। তুমি কি জানো?

বাবা! না তো! কতটা জমি?

তা ঠিক জানি না। ফালাকাটায় আমার যে-কাকা থাকেন, তিনিই বাবাকে সেদিন বলছিলেন রজতশুভ্র দাশগুপ্তর অনেকটা জমি রয়েছে। কে একজন নাকি জমিটা কিনতে গিয়ে ব্যাপারটা ধরা পড়ে। আমার কাকা বিশ্বতোষ রায় সেটলমেন্টেই চাকরি করেন।

বাবা তো হুইমজ়িক্যাল ছিলেন। হয়তো কিনেছিলেন, তারপর আমাদের জানাতে ভুলে গেছেন।

দলিলটা খুঁজে দেখো। মেসোমশাইয়ের কাগজপত্রের মধ্যে হয়তো পাবে।

জমিটা কি বেহাত হয়ে গেছে?

যতদূর মনে হয়, উনি কাউকে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। বর্গা, রেজিস্ট্রি আছে। বেহাত হয়তো হয়নি। কাল কাকা আমাদের জমিটা দেখাতে নিয়ে যাবে।

আমাদের জন্য যে তুমি এই কষ্টটা করছ তাতে ভারী লজ্জা পাচ্ছি।

কষ্ট কীসের? এটা তো একটা আবিষ্কার। তার আনন্দ আছে না? এর মধ্যে তুমি দলিলটা খুঁজে দেখো।

আচ্ছা দেখব।

একটু বেলার দিকে বাবার ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে কাগজপত্রের ফাইল ঘেঁটে দেখছিল সুমিত।

নিঃশব্দে মিমি দরজায় এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কী খুঁজছ বাবাই?

এই দেখ না, খবর পেলাম বাবা নাকি ফালাকাটায় একটা জমি কিনে রেখেছিল।

রেখেছিল তো।

তুই জানিস?

কেন জানব না? গোবিন্দকাকু ওখানে আলু চাষ করে।

সুমিত মেয়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বলে, কে বলল তোকে?

আমি জানি। তুমি কি দলিলটা খুঁজছ?

হ্যাঁ।

কী করবে? বিক্রি করবে নাকি?

সেসব পরের কথা। জমিটা যে আছে তাই তো জানতাম না।

দলিল আমার কাছে আছে।

তোর কাছে! তোর কাছে কেন?

দাদু বলেছিল যত্ন করে রাখতে।

একবার দেখাতে পারিস আমাকে?

পারি।

কে ওখানে আলু চাষ করে বললি?

গোবিন্দকাকু।

সে কে? তাকে তুই চিনিস?

চিনি। গোবিন্দ আইকত। দাদুর কাছে মাঝে মাঝে আসত। খুব ভাল লোক।

কতটা জমি আছে?

ষোলো বিঘে। জমিটার কথা তোমাকে কে বলল?

ফালাকাটা থেকে একজন ফোন করে জানাল। জমিটা ক্লেম করতে হলে দলিলটা দরকার।

ক্লেম করবে? ক্লেম করবে কেন? জমি তো দাদুরই আছে।

কী করে বুঝলি? বেহাতও তো হয়ে যেতে পারে।

মিমি থমথমে মুখ করে বলে, গোবিন্দকাকু আলু আর ধান বিক্রির টাকা দাদুর অ্যাকাউন্টে জমা করে দেয়। বেহাত হবে কেন?

কী আশ্চর্য? তুই এত খবর জানিস? আর আমি কিছুই জানি না!

মিমি খুব নরম গলায় বলল, দাদু ভয়ে তোমাকে বলেনি।

ভয়! ভয় কীসের?

তুমি হয়তো দাদুকে বকতে।

সুমিত একটু গুম হয়ে গেল। এ কথা ঠিক যে, বাবার আহাম্মকি দেখে অনেক সময়েই সে রেগে যেত, চেঁচামেচিও করত। রজতশুভ্রর বিষয়বুদ্ধিহীনতা ছিল দেখার মতো। একবার ভুয়ো প্রোমোটারের পাল্লায় পড়ে অনেকগুলো টাকা খোয়াতে বসেছিলেন। বিস্তর ঝামেলা করে সেই টাকা উদ্ধার করতে হয়। রজতশুভ্রকে মাঝে মাঝে শাসন করার দরকার হত। সেটা ওঁর ভালর জন্যই।

বিরক্ত মুখ করে সে বলল, কলকাতা থেকে এত দূরে কোন ধাপধাড়া-গোবিন্দপুরে এতটা জমি কিনে ফেলে রাখা কি বুদ্ধিমানের কাজ? তাও কাউকে না জানিয়ে! আরও কোথায় কী কিনে ফেলে রেখেছে কে জানে! তুই জানিস?

মিমি যেন একটু কুঁকড়ে গেল। চোখে চোখ রাখল না। মিনমিন করে বলল, আমি ঠিক জানি না।

তার মানে হল, মিমি প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল। দাদু আর নাতনি খুব ক্লোজ় ছিল সন্দেহ নেই। দাদু নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে মিমিও হঠাৎ করে পালটে গেছে। আগের মতো হাসে না। হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে না, ঘর সাজায় না। একটু চুপচাপ, বইমুখো, উজ্জ্বলতাহীন। আগে মোবাইলে দীর্ঘক্ষণ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলত। আজকালও কথা বলে তবে বেশিক্ষণ নয়। বিষণ্ণতার কারণটা সুমিত জানে বলে মেয়েকে ঘাঁটায় না। ভাবে, ফেজ়টা কেটে যাবে।

তুমি কি দলিলটা চাও, বাবাই?

সুমিত মেয়ের দিকে চাইল। একটু মায়া হল তার। বলল, জমিটা বিক্রি করে দিই এটা বোধহয় তুই চাস না, না? ঠিক আছে, তাই হবে। তবে দলিলের একটা কপি দরকার।

কপি আছে।— বলে মিমি গিয়ে তার ঘর থেকে দলিলের একটা সার্টিফায়েড কপি এনে দিল।

ওরিজিনালটা?

আমার কাছে আছে।

থাক। তোর কাছেই থাক।

আরও চারদিন বাদে বৈদূর্য ফিরে এল। মুখে হাসি। যেন একটা যুদ্ধ জয় করে ফিরেছে।

কী খবর বৈদূর্য? মনে হচ্ছে একটা ভেকেশন কাটিয়ে এসেছ।

না স্যার। অন ডিউটি।

কিন্তু রেজ়াল্ট অষ্টরম্ভা। তাই না?

হ্যাঁ স্যার। কেসটা আপনি ক্লোজ় করে দিতে পারেন।

হুঁ। তাই ভাবছি। কোনও ট্রেসই যখন পাওয়া গেল না, তখন ধরেই নিতে হবে যে, হি ইজ় নো মোর।

না স্যার। আমি আপনার সঙ্গে একমত নই।

তার মানে?

একটু ডিটেলস্-এ বলতে পারি স্যার? আপনার হাতে কি সময় আছে?

বলো। ইফ ইট হ্যাজ় এনি রেলেভ্যান্স।

প্রথম কথা হল, নিয়মমতো কাউকে খুঁজে পাওয়া না গেলে তাকে মৃত বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। দ্বিতীয় গোলমেলে ব্যাপার হল, কেউ না কেউ বা সকলেই কিছু একটা চেপে যাচ্ছে। আপনার বাবার পি আর কেমন ছিল বলে আপনার মনে হয়?

বুঝিয়ে বলো।

আমি আপনার বাবাকে কখনও দেখিনি। শুধু কয়েকটা ফোটোগ্রাফ। কিন্তু একটা মানুষকে আঁচ করার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। সেটা পুষিয়ে যায় মানুষের রিঅ্যাকশন দেখে। শিববাবুর কথাই ধরুন। বুড়ো মানুষ, আশির ওপর বয়স। তাঁর বাড়িতে শাশুড়ি-বউয়ে খুব অশান্তি। মোড়ের চায়ের দোকানে এসে খবরের কাগজ পড়েন সকালের দিকটায়। চেনেন নাকি?

চিনি। শিবুজ্যাঠা।

রজতবাবুর কথা তুলতেই এমন ভাবালু হয়ে পড়লেন যে, চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। ধুতির খুঁটে চোখ মুছে বললেন, অমন অজাতশত্রু মানুষ কি হারিয়ে যেতে পারে! কত গুণের যে আধার! দণ্ডপানিকে তো ওই বাঁচিয়েছিল, নইলে বাঁচত নাকি? ডিটেলস্ অবশ্য উনি বলেননি। শুধু বললেন, যাবে কোথায়? কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। খোঁজো, খোঁজো, ভাল করে খোঁজো। দণ্ডপানিটা কে মশাই?

শিববাবুর নাতি। বর্ষার দুপুরে পুকুরের ধারে চলে গিয়েছিল একা একা। তখন মাত্র তিন কি চার বছর বয়স। পা পিছলে জলে পড়ে যায় এবং কেউ কিছু টেরও পায়নি। কাছাকাছি একটা বাড়িতে আমার বাবা তখন বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলছিলেন। তাসের নেশা ছিল খুব। হঠাৎ কে জানে কী মনে হল, উনি হাতের তাস ফেলে দৌড়ে এসে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে বাচ্চাটাকে তোলেন। বিস্ময়ের কথা হল, বাবার টের পাওয়ার কথাই নয়।

অমল ভট্টাচার্যকে কি মনে আছে আপনার? পলিটিক্যাল লিডার!

আছে। আমরা ওঁর কাছে ব্রতচারী শিখতাম।

তিনিই। রজতবাবুর কথা তুলতেই যেন টগবগ করে উঠলেন। বললেন, দিলদরিয়া কাকে বলে জানো? যার দরিয়া বা সমুদ্রের মতো মন। রজতের পকেটে পয়সা থাকত না, কিন্তু মুখে হাসি থাকত সবসময়। নিজের ঘড়ি, আংটি, সোনার বোতাম খুলে দিয়ে একবার আমাকে জামিনে ছাড়িয়েছিল। এই জায়গা ছেড়ে কেন যে গেল কে জানে। এখানেই তো রাজত্ব করতে পারত হে!

হুঁ। বুঝলাম। কিন্তু এতে কী প্রমাণ হয়?

আর একটু ধৈর্য ধরে শুনুন স্যার। আরও বিস্তর মানুষের স্টেটমেন্ট আমার নোট করা আছে। সেগুলো বাদ দিচ্ছি। আপনি কি গোবিন্দ আইকতকে চেনেন স্যার?

না, শুনেছি সে বাবার ষোলো বিঘে জমি চাষ করে।

ঠিক। ফালাকাটা শহর থেকে খানিকটা দূরে গ্রামে তার দিব্যি বাড়ি। মাঝবয়সি চাষিবাসি লোক। বউ আর মা আর পাঁচটা ছেলেপুলে নিয়ে ভরা সংসার। বাড়ির লাগোয়া চাষের জমি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তিনটে গোরু আছে। অফুরন্ত নারকোল আর সুপুরি। লোকটার শ্যালো আছে। তিনটে মোটরবাইক, শিগগিরই ট্রাক্টরও কিনবে। ফলাও অবস্থা। কী যত্ন করে যে আমাদের খাওয়াল, তা বলার নয়। পায়েসের চাল, গন্ধলেবু, আলু কত কী দিয়ে দিল সঙ্গে।

এত ডিটেলস্-এর কি দরকার আছে বৈদূর্য?

আছে স্যার। অ্যাম্বিয়েন্সটা বোঝাতে একটু সুবিধে হয়। আপনার বাবার কথা উঠতেই বলেছিল, মানুষ আর ভগবানের মধ্যে বড্ড গুলিয়ে ফেলি বাবা। মহিমবাবুর জমি চাষ করতাম। তা তিনি জাহাঁবাজ লোক। পার্টি করেন তো। লাঠিবাজি করে উৎখাত করে দেন। উনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, কী আর করি! বউ-বাচ্চা আর বুড়ো মাকে নিয়ে উপোস করে মরার দশা। মহিমবাবু জমি বেচে দিলেন রজতবাবুর কাছে। নতুন বর্গা বসিয়ে দিলেন। তখন আমি একদিন হাউমাউ করে গিয়ে রজতবাবুর পায়ে পড়লাম। আমাকে বাঁচান, বড় অবিচার হচ্ছে। বাবুই তখন আইন ঘেঁটে নতুন বর্গা খারিজ করে আমাকে বহাল করেন। গণ্ডগোল হয়েছিল বটে, তবে বাবু পিছোননি। সেই থেকে জমি আবাদ করে আসছি। নিজেরও বারো বিঘে জমি হয়েছে।

গোবিন্দ আইকত লোকটা কেমন?

সলিড লোক স্যার। স্তম্ভের মতো। আপনার বাবা কন্ট্রাক্টর ছিলেন। তবে খামখেয়ালি ছিলেন বলে মাঝে মাঝে অনেক টাকা রোজগার করতেন, আবার কখনও কখনও বসে যেতেন। ওই দুর্দিনে গোবিন্দ আইকত আপনার বাবার কাছে চাল, ডাল, আলু আর টাকা পৌঁছে দিত। পটভূমিটা কি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন স্যার?

পারছি। কিন্তু আসল কথাটা কী বৈদূর্য?

আসল কথা কি না জানি না। তবে ঘটনাটা হল, গোবিন্দ আইকত যা বিশ্বাস করে তা থেকে নড়ে না। আপনার বাবা তার কাছে ভগবানের মতো। আমরা চলে আসার আগে সে নিয়ে গিয়ে আমাদের একটা ঘর দেখায়। ঘরটা তালাবন্ধ থাকে। তালা খুলে ভেতরে নিয়ে গিয়ে দেখাল, একখানা মজবুত বড় চৌকির ওপর পরিষ্কার বিছানা পাতা। ওপরে চমৎকার দামি বেডকভার। মেঝেতে বড় পাপোশ, তার ওপর একজোড়া হাওয়াই চটি সযত্নে রাখা। সিলিং ফ্যান আছে। একধারে টেবিল আর চেয়ার। টেবিলে হাতের কাজ করা ঢাকনা, চেয়ারেও পিঠে ঢাকনা। একটা আলনা, জলচৌকি সব জায়গা মতো রাখা। গোবিন্দ বলল, এই ঘরটা আমি বাবুর জন্য আলাদা করে রেখেছি। যদি কখনও আসেন তো থাকবেন। এ ঘরে আমরা কেউ থাকি না, ওই বিছানায় কেউ কখনও শোয়নি, ওই হাওয়াই চটি কেউ কখনও পড়েনি। আমার মনে হচ্ছিল, ঘরটা যেন অনেকটা ঠাকুরঘরের মতো। একটু চন্দন ধূপকাঠির গন্ধও পেয়েছিলাম যেন। ঘরটায় ঢুকে আমার কেন যেন মনে হয়েছিল, আমি রজতশুভ্র দাশগুপ্তর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। যেন একটা অদৃশ্য পরদার ওপাশেই তিনি রয়েছেন।

শুধু মনে হওয়া থেকে তো কিছু বোঝা যায় না।

না স্যার। সে কথা ঠিক। তবে ওই হাওয়াই চটিজোড়ার হয়তো কিছু বক্তব্য ছিল।

তার মানে কী বৈদূর্য?

আপনি অনুমান পছন্দ করেন না। কিন্তু আমাদের প্রফেশনে অনুমান ছাড়া উপায় নেই। ওই হাওয়াই চটিজোড়া নতুন এবং ঝকঝকে ছিল। কিন্তু আমার খুঁতখুঁতে চোখে মনে হল, নতুন হলেও চটিজোড়া কিছুটা ব্যবহার করা হয়েছে। একেবারে নতুন আর অল্প ব্যবহার করা চটির মধ্যে পার্থক্যটা এতই সামান্য যে, তফাত করাই কঠিন।

তোমার কি কিছু সন্দেহ হয় বৈদূর্য?

ব্যাপারটা শুধু সন্দেহই স্যার। কারণ একজোড়া হাওয়াই চটি থেকে

খুব বেশি সূত্র পাওয়া মুশকিল। আপনি কি পরিতোষবাবুর ভাই বিশ্বতোষবাবুকে চেনেন?

সামান্য চিনি। মাঝে মাঝে কুচবিহারে আসতেন।

আপনার বাবার সঙ্গে খুব ভাব ছিল। বিশ্বতোষ বড্ড ভাল লোক। আমার মতো একজন সামান্য মানুষকেও কী যত্নটাই করলেন ওঁরা। একটা নতুন গামছা অবধি দান করেছেন।

উঃ বৈদূর্য!

ওই অ্যাম্বিয়েন্সের জন্যই বলছি আর কী। ওতে পিকচারটা একটু ক্লিয়ার হয়। বিশ্ববাবু পুরনো বাংলা রাগসংগীতের খুব ভক্ত। বিস্তর রেকর্ডের কালেকশন। নিজেও মাঝে মাঝেই সুরেলা গলায় গুনগুন করেন। তো একদিন সন্ধেবেলা খুব আড্ডা হচ্ছিল। নীলাদি, বিশ্ববাবু, তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, দুই ছেলে। চা, চানাচুর আর গান। মাঝে মাঝে কথাবার্তা। তা একটা পুরনো গান গেয়ে উঠে হঠাৎ বিশ্ববাবু বললেন, এ গানটা রাজুদার গলায় শুনতে হয়। এখনও গলার কী দাপট! বলেই হঠাৎ অন্য কথায় চলে গেলেন সবাই।

এইখানে একটু থামল বৈদূর্য। তারপর বলল, বুঝলেন কিছু?

আমি বোকা নই বৈদূর্য।

আমার অবজ়ার্ভেশন খুব খারাপ নয় স্যার। হাওয়াই চটির ব্যাপারে আমার ডিডাকশনটা খুব ভুল নাও হতে পারে।

সুমিত গম্ভীর মুখে বলল, ইউ হ্যাভ ডান এ গুড জব। গোয়েন্দা হিসেবে তুমি সত্যিই ভাল। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

বৈদূর্য কাতরস্বরে বলল, ওটা অভিশাপ স্যার। আমি গোয়েন্দা থাকতে চাই না। নিতান্তই পেটের দায়ে পড়ে আছি স্যার। নইলে এই বিচ্ছিরি কাজ কে করে?

কিন্তু তোমার অবজ়ার্ভেশন ভীষণ ভাল, ডিডাকশন ভাল, এমনকী ম্যানিপুলেশনও দারুণ। একজন ভাল গোয়েন্দার যা যা দরকার হয় তোমার সব আছে।

জানি স্যার। কিন্তু সব কেসই তো আর আপনার বাবাকে খোঁজার মতো নিরীহ কাজ নয়। বেশির ভাগ কাজই ডার্টি। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক আমাদের এনগেজ করলেন একটা অদ্ভুত কাজে। কী কাজ জানেন? তাঁকেই ফলো করতে হবে এবং ফোটো তুলতে হবে। তিনি কার সঙ্গে কোথায় কোথায় যাচ্ছেন সব রেকর্ড রাখতে হবে। নিজের পেছনে কারা গোয়েন্দা লাগায় জানেন? ব্ল্যাকমেলাররা। কিন্তু আমাদের তো কিছু করার নেই। মোটরবাইকে ফলো করতে শুরু করলাম। দেখলাম সঙ্গে ভারী সুন্দরী এক মহিলা। সম্ভবত পয়সাওলা লোকের বউ। তিনমাস ফলো করার পর সব রিপোর্ট জমা দিলাম। জানতাম মহিলার কপাল খারাপ। ক্যাশমানি দিতে দিতে পাগল হয়ে যাবে।

মাই গড! এরকমও হয় নাকি?

দুনিয়ায় কত নোংরামি হয় স্যার। কয়েকদিন আগে সেই ভদ্রমহিলা আমাকে ফোন করেছিলেন। সোজা জিজ্ঞেস করলেন, কত টাকা পেলে আমি লোকটাকে খুন করতে রাজি। পাঁচ লাখ?

প্রাইভেট গোয়েন্দারা কি খুনও করে বলে ওর বিশ্বাস?

সেইটেই ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, খুনখারাপি আমাদের কাজ নয়। তখন বললেন আপনারা তো ক্রিমিনালদের খবর রাখেন। আমাকে একজন ভাড়াটে খুনির সন্ধান দিন। কোনও অজুহাতই মানতে চান না। শেষে ক্ষান্ত হলেন বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস উনি শেষ অবধি হয়তো হায়ার্ড কিলার পেয়েও যাবেন। আজকাল পয়সা পেলে লোক কী না করে বলুন। পাতাখোররাও পয়সা পেলে মানুষ মেরে দেয়।

কিন্তু তোমার কাজে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি বৈদূর্য। আজ আমার বুক থেকে একটা ভার নেমে গেছে। তুমি গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেবে শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। খুব সোজা সরল বোকা-বোকা হাবভাব তোমার, কিন্তু ইউ আর এ স্লাই ফক্স।

আগেই এতটা নিশ্চিন্ত হবেন না স্যার। আমি বলি, আপনি একবার নর্থ বেঙ্গল থেকে ঘুরে আসুন। কারণ আমি অদৃশ্য পরদাটা সরাতে পারিনি।

সেটা আমি গেলেই কি সরবে মনে করো?

না। তবে আপনি আপনার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

সুমিত একটু হাসল, হ্যাঁ, সেটা ভাল প্ল্যান। মিমি ওর দাদুকে খুব মিস করে। দাদু বেঁচে আছে খবরটা পেলে ও যে কী খুশিই হবে!

বৈদূর্য একটু হাসল, আপনি তাই ভাবেন বুঝি?

সুমিত অবাক হয়ে বলে, কিছু কি ভুল বললাম?

স্যার, একটু আগেই আপনি আমাকে আদর করে স্লাই ফক্স উপাধি দিয়েছেন। ভুলে যাবেন না।

যাইনি।

আমার বিশ্বাস আপনার মেয়ে তার দাদুর সব খবরই রাখে।

সুমিত ভ্রু কুঁচকে বৈদূর্যের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, সেটা কী করে সম্ভব? জানলে আমাদের বলত না? ও তো জানে আমরা বাবার জন্য কীরকম টেনশনে আছি। তাছাড়া, মিমি তো আমার কাছে কিছুই লুকোয় না।

আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই স্যার। হতে পারে আপনি যা বলছেন তাই সত্যি।

এই বলে চুপ করে গেল বৈদূর্য।

তুমি কিছু একটা বলতে গিয়ে চেপে যাচ্ছ বৈদূর্য!

অভয় না দিলে কী করে বলি স্যার? আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না।

বৈদূর্য, আমি তো বলছি তোমার লাইন অফ অপারেশন আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। তোমার রিপোর্টের ওপর আমি নির্ভর করছি। নির্ভয়ে বলো।

আপনি কখনও নারকোল কোরা দিয়ে মুড়ি খেয়েছেন স্যার? না খেয়ে থাকলে খেয়ে দেখবেন।

বহুবার খেয়েছি।

নারকোল কোরা দিয়ে মুড়ি একটা অপার্থিব জিনিস। সঙ্গে যদি কচি শসা থাকে।

তুমি কি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছ বৈদূর্য?

না স্যার, ওই অ্যাম্বিয়েন্সটা ক্রিয়েট করার জন্য বলছি।

স্কিপ ইট।

ঠিক আছে স্যার। আসলে একদিন সকালে আমি যখন জলখাবার খাচ্ছিলাম— ওই নারকোল আর টাটকা লাল মুড়ি উইথ শসা, তখন নীলাদিদির সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় উনি বললেন, শুনেছি মিমি তার দাদুকে খুব ভালবাসে। খুব ক্যাজুয়ালি বলা একটা কথা। শুনে আমার কিছুই মনে হল না। একটা সাধারণ কথা, একটা নিরীহ স্টেটমেন্ট। কোনও অসঙ্গতি নেই। আপনি কি কথাটার মধ্যে কোনও ঘাপলা খুঁজে পাচ্ছেন স্যার?

না, মিমি তো সত্যিই তার দাদুকে খুব ভালবাসে। এর মধ্যে ঘাপলার কী আছে?

এগজ্যাক্টলি, তাই আমি কথাটা শুনেও কোনও গুরুত্ব দিইনি। অ্যাপারেন্টলি গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারও নয়। কিন্তু তারপর সারা সকাল কিন্তু ওই কথাটা বারবার মাছির মতো আমার মাথায় ভনভন করতে লাগল। বারবারই মনে আসছে, মিমি তার দাদুকে খুব ভালবাসে। কিছুতেই কথাটাকে মাথা থেকে তাড়াতে পারি না। পরিতোষবাবুর সাইকেলটা নিয়ে সাগরদিঘি চক্কর দিতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় একটা ঝুপড়ির চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে যখন ভাঁড়ে চা খাচ্ছি, তখন হঠাৎ মাথায় যেন একটা বাজ পড়ল। তড়াক করে মনে হল, নীলাদিদি থাকতেন আমেদাবাদে, আপনাদের সঙ্গে ওঁর কোনও যোগাযোগও ছিল না। তাহলে উনি কী করে জানলেন যে, আপনার মেয়ের নাম মিমি?

সেটা জানা অসম্ভব নয়। মিমির জন্ম পনেরো বছর আগে, তখন বাবার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ ছিল।

ঠিক কথা স্যার। আমিও সেটাই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু তবু কথাটা ভনভন করেই যাচ্ছিল। ফের একটা ঝলকানি হল মাথায়, মিমি যে তার দাদুকে খুব ভালবাসে, এটা উনি কী করে জানলেন?

মিমি বরাবরই তার দাদুর ন্যাওটা, সবাই জানে।

ঠিক কথা স্যার, ঠিক কথা। আমিও তাই সেটাকে তেমন গুরুত্ব দিইনি। তবু আমার ভেতরে একটা পোকা কুটকুট করেই যাচ্ছিল। ওই কথাটার মধ্যে কিছু যেন একটা লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে হচ্ছিল।

কী লুকিয়ে থাকবে বৈদূর্য?

সেটা কী করে বলি। নীলাদির ছেলেটা খুব দুষ্টু আর চঞ্চল। সারাদিন ছুটে বেড়ায়, মাঝে মাঝেই দৌড়ে রাস্তায় চলে যায়। নীলাদিদি সারাদিন ছেলের পেছনে ছুটে ছুটে হয়রান। বলেন, দেখো ভাই, ছেলের পেছনে ছুটে ছুটে আমার ওজন কমে গেছে।

বৈদূর্য! প্লিজ!

ওই অ্যাম্বিয়েন্সের জন্য স্যার। হ্যাঁ যা বলছিলাম। দুপুরে নীলাদিদি যখন ছেলেকে স্নান করিয়ে ভাত খাওয়াতে বসিয়েছেন তখনই সুযোগটা এল। প্রথম কথা, ছেলেকে খাওয়াতে নীলাদিদির অনেক সময় লাগে। দ্বিতীয় কথা, ওঁর মোবাইল ফোনটা প্রায় সময়েই এখানে ওখানে পড়ে থাকে। দিনের মধ্যে দশবার উনি মোবাইল হারান এবং খুঁজে হয়রান হন। ওদের বাইরের ঘরে একটা গোল বেতের টেবিলে নীলাদিদির মোবাইলটা পড়ে ছিল। আমি লক্ষ করে রেখেছিলাম।

আমাদের আয়ু তো অনন্ত নয় বৈদূর্য।

না স্যার। তবে কিনা ডিটেলস-এরও একটা ইমপর্ট্যান্স আছে। আমাদের কারবার তো ডিটেলস নিয়েই। আমি ফোনটা নিয়ে ফোন-বুক খুলে মিমি নামটা সার্চ করতেই একটা নম্বর দেখা গেল। কল বাটনটা টিপে অপেক্ষা করলাম। একটু পরেই একটা বাচ্চা মেয়ের গলা বলে উঠল, হ্যাঁ পিসি, বলো।

বৈদূর্য চুপ করে সুমিতের দিকে চেয়ে রইল।

আমি শুনছি বৈদূর্য! বলো।

এ হ্যাপি ভয়েস স্যার। যেন ফোনটা আসায় মেয়েটা খুব খুশি হয়েছে। এবং কথাটা লক্ষ করলে দেখবেন, মেয়েটির সঙ্গে নীলাদিদির প্রায়ই কথা হয় বলে ধরে নিলে ভুল হবে না।

মিমি ইজ় এ ভেরি কমন নেম। এই নামে হাজারটা মেয়ে থাকতে পারে। এ যে আমার মেয়ে মিমি, তা নিশ্চয়ই নয়। কারণ মিমি আর নীলার মধ্যে কখনও কোনও পরিচয় ছিল না। নীলার কথা মিমি জানেই না।

ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট স্যার। আমি কোনও কথা না বলে কলটা কেটে দিলাম এবং কল রেকর্ডটাও ডিলিট করে দিই।

তারপর?

তারপর আর কিছু নেই স্যার। অ্যাবসলিউটলি নাথিং।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে?

আপনার মেয়ে মিমির টেলিফোন নম্বর আমার জানার কথা নয়। আমি জানিও না। ঠিক তো?

ঠিক।

তাই আমি নম্বরটা সেভ করে এনেছি। প্লিজ় স্যার, এই নম্বরটা একটু দেখুন। এটা কি আপনার মেয়ের নম্বর বলে মনে হয়?

বৈদূর্যর সস্তা মোবাইলের অস্পষ্ট স্ক্রিনে যে-নম্বরটা জ্বলজ্বল করছে সেটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সুমিত। তারপর বলল, মাই গড! এটা তো মিমিরই নম্বর! আমার মেয়ে!

কোনও ভুল হচ্ছে না তো স্যার? ইচ্ছে করলে আপনি কল করে দেখে নিতে পারেন।

তার দরকার নেই। দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার আমি মেয়েকে ফোন করি। অ্যান্ড হোয়াট এ ট্যাঙ্গল! এসব কী হচ্ছে বলো তো!

মিমির সঙ্গে নীলাদিদির যোগাযোগ আছে। দে আর ভেরি ক্লোজ়। তাই বলছিলাম স্যার, আপনার মেয়ে সম্ভবত তার দাদুর সব খবরই

রাখে। হয়তো দাদুর সঙ্গে রেগুলার তার কথাবার্তাও হয়।

কিন্তু তবু আমাকে একবারও জানায়নি! আমি এত দুশ্চিন্তা করছি দেখেও ওর একটুও মায়া হল না?

উত্তেজিত হবেন না স্যার। হিউম্যান পয়েন্টগুলো সবসময়ে লজিক দিয়ে বোঝা যায় না। মানুষ লজিক্যাল নয়ও।

চেকবইটা বের করে একটা দশ হাজার টাকার চেক লিখে বৈদূর্যর হাতে দিয়ে সুমিত বলল, ইটস এ গিফট ফর ইউ। গোয়েন্দাগিরি ছেড়ো না বৈদূর্য। তুমি একজন ধুরন্ধর গোয়েন্দা। ইউ আর ব্রিলিয়ান্ট।

থ্যাংক ইউ স্যার।

পাঁচ

তুমি রাখি পরেছ বুঝি?

হ্যাঁ।

অতগুলো রাখি? তোমার বুঝি অনেক বোন?

আমার একটা দিদি আর একটা বোন, বাকি তিনজন পাতানো বোন। পাড়ার মেয়ে।

ভাইবোন পাতানো যায়, না? কীভাবে পাতাতে হয় বলো তো!

আয়ুষ্মান একটু হেসে বলে, ওসব আমাদের পাড়ায় হয়। বস্তিপাড়া তো! ভাইবোন পাতাতে গেলে কিছু করতে হয় না, মনে করলেই হয়।

বেশ তো! রাখি পরতে তোমার ভাল লাগে?

খারাপ তো কিছু নয়। আদর করে বেঁধে দিয়ে যায়।

আমার কাছে কিন্তু রাখি আছে। পরবে?

কেন পরব না?

কিন্তু পরবে কোথায়? তোমার হাতে তো আর জায়গা নেই।

হয়ে যাবে। এই তো রাখিগুলো একটু কাছাকাছি সরিয়ে আনলেই জায়গা হয়ে যাবে।

তাহলে হাতটা একটু পেছনে বাড়িয়ে দাও।

দাঁড়াও গাড়িটা একটু সাইড করে দাঁড় করিয়ে নিই। সামনের মোড়টা পার হওয়ার পর।

ট্রাফিক সিগন্যালটা পেরিয়ে সাবধানে গাড়িটা দাঁড় করায় আয়ুষ্মান। তারপর ডান হাতটা পেছন দিকে বাড়িয়ে দেয়। মিমি তার স্কুলব্যাগ

থেকে খুব ঝক্কাস একটা রাখি বের করে যত্ন করে হাতে বেঁধে দিয়ে বলল, বেশ দেখাচ্ছে, না?

হ্যাঁ, খুব সুন্দর রাখি।

আমার ভাই নেই বলে কাউকে রাখি পড়াতে পারছি না। আগে দাদুকে পরাতাম।

এখন পরাও না?

দাদু তো নেই। হারিয়ে গেছে।

হারিয়ে গেছেন? কী করে হারালেন?

কেউ জানে না। পুলিশ খুঁজে পায়নি।

হারিয়ে যায় তো বাচ্চারা। বুড়ো মানুষ কী করে হারাবে?

এ বছর আমি দাদুর ছবির সামনে একটা রাখি রেখে দিয়েছি। দাদুকে ভাইফোঁটাও দিতাম। আমি কি তোমাকে দাদা বলে ডাকতে পারি?

নিশ্চয়ই।

তোমার সঙ্গে সবসময়ে পড়ার বই থাকে জোয়ারদা। তুমি কি পড়াশুনো করো?

হ্যাঁ। সামনেই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা।

মামার কাছে শুনেছি মাধ্যমিকে তুমি স্টার পেয়েছিলে।

মাধ্যমিকে আজকাল মেলা ছেলেমেয়ে স্টার পায়। ওটা তেমন কিছু নয়।

তাই বুঝি? অত সোজা নয়। হায়ার সেকেন্ডারিতে তো খুব পড়তে হয় শুনেছি। তুমি গাড়ি চালিয়ে পড়ার সময় পাও?

এই যে তোমাকে স্কুলে পৌঁছে দেব, তারপর অনেকটা সময় বসে থাকতে হবে, তখন পড়ি।

তোমাকে খুব কষ্ট করতে হয়, না?

না না, কষ্ট কীসের? যখন ট্যাক্সি চালাতাম তখন বরং খানিকটা কষ্ট ছিল। পড়ার সময় পেতাম না।

তুমি ট্যাক্সিও চালাতে বুঝি?

হ্যাঁ। আমার বাবা তো ট্যাক্সি ড্রাইভারই ছিল। এখন শরীর খারাপ বলে চালায় না। আমি ওঁর ট্যাক্সিই চালাতাম।

এই নাও ক্যাডবেরি। রাখির গিফ্‌ট।

আয়ুষ্মান খুব লাজুক হেসে নিল। মেয়েটা ভারী ভাল তো! টুকুসের বয়স এখন সতেরো ছাড়িয়েছে। সে এখন আয়ুষ্মানের ওপর রীতিমতো ছড়ি ঘোরায়। হাবভাব মোটেই ছোট বোনের মতো নয়। বড় দিদি বা মায়ের মতো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খোঁজখবর নেয়।

টুকুস জিজ্ঞেস করল, মেয়েটা দেখতে কেমন রে?

ভালই। ফরসা, পুতুল-পুতুল।— আয়ুষ্মান আলগা উত্তর দিল।

বয়স কত?

দেখে তো দশ-বারো বছরের বেশি মনে হয় না। তবে ক্লাস নাইনে পড়ে।

যাঃ, তাহলে পনেরো-ষোলো। তোর কোনও আন্দাজই নেই।

হতে পারে। তবে কথাবার্তা কিন্তু খুব ছেলেমানুষের মতো।

কীরকম শুনি!

শোনার মতো কিছু নয়। একটু ম্যাচিয়োরিটির অভাব আছে।

বোকাসোকা নাকি?

না না। বোকা নয়, তবে একটু সরল গোছের। ভাল মেয়ে।

তোর দিকে তাকায়-টাকায়?

আরে না। সেরকম ব্যাপার নয়। আর আমি তো গাড়ি চালাই, লক্ষ করি নাকি?

আয়না দিয়ে দেখিস না মাঝে মাঝে?

মাঝে মাঝে চোখ পড়ে যায়। চুপচাপ বসে থাকে আর জানলার বাইরের দৃশ্য দেখে।

তোর সঙ্গে কথা-টথা বলে না?

কী বলবে? আমার সঙ্গে না বললেও মাঝে মাঝে মোবাইলে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে।

বয়ফ্রেন্ড আছে?

এখনও কাউকে দেখিনি।

যখন মোবাইলে কথা বলে তখন শুনে বুঝতে পারিস না?

এই মেয়েটা অন্য টাইপ। তোদের মতো নয়। তোরা যেমন কথা শুরু করলে থামতে জানিস না, মিমি ঠিক উলটো। বেশি কথা বলে না। বয়ফ্রেন্ড আছে বলে মনে হয় না।

খুব সাজে?

এমনিতে তো স্কুলড্রেস। তবে প্রায়ই পার্টিতে যায়, তখন সাজে।

কেমন সাজে?

মেয়েদের সাজের আমি কিছু বুঝি? তবে বেশ দামি ড্রেস পরে। বিউটিশিয়ানদের কাছে গিয়ে কীসব করিয়ে আসে।

তোকে হ্যাটা করে না তো!

না। খুব ভদ্র মেয়ে।

কী বলে ডাকে?

এখনও তো ডাকাডাকির দরকার হয়নি।

তুমি বলে, না আপনি?

তুমি।

কেন? তুই ওর চেয়ে কত বড়!

আরে আজকাল তো আপনি বলা উঠেই গেছে।

বেশি গ্যালগ্যালে ভাব দেখাবি না। গম্ভীর হয়ে থাকবি।

তোর ভয়টা কীসের?

তুই যা বোকা!

দূর। ওসব হাই ফ্যামিলির মেয়ে কি আমাদের পাত্তা দেয় নাকি! আমাদের কি কোনও স্ট্যাটাস আছে?

কৃশকায়া ছোটোখাটো চেহারার টুকুস এই সতেরো পেরিয়েছে। এখনও কিশোরী বলে মনে হয়। মিষ্টি একখানা মুখ আর দু'টি মায়াবী চোখ ওর সম্বল। কালো নয়, ফরসাও নয়। নিরীহ, শান্ত, চুপচাপ। আপনমনে পড়ে, ঘরের কাজ করে, গুনগুন করে গান গায়, কুরুশে লেস বোনে— আর-পাঁচটা মেয়ের মতোই। চোখে পড়ার মতো নয়। শুধু আয়ুষ্মান টের পায় যে, টুকুসের মধ্যে একটা কিছু আছে যা সাধারণ নয়। মনে মনে বোনকে সে বেশ সমীহ করে। কিছু চাইলে বা বায়না করলে তক্ষুনি এনে দেয়। টুকুসের অবশ্য চাহিদা বা বায়না নেই বললেই চলে।

মিমিকে স্কুলের সামনে নামিয়ে দিয়ে স্কুলের পেছন দিকে একটা নিরিবিলি গলিতে গাড়িটা পার্ক করে দিল আয়ুষ্মান। তারপর ডান হাতের দামি রাখিটা দেখল। এটা দেখালে টুকুস খুশি হবে। রাখি বাঁধা মানেই ভাই-বোন। তাদের মধ্যে অন্য কোনও রিলেশন হতে নেই। সংসার যদিও সব নিয়ম মেনে চলে না, তবু এটাও তো একটা আশ্বাস। রাখি আপাতত রক্ষাকবচ। মেয়েটা তাকে একটা ক্যাডবেরি বার গিফ্‌ট করেছে। তারও কি উচিত নয় ওকে একটা কিছু গিফ্‌ট দেওয়া? কথাটা মনে আসতেই একটু চিন্তায় পড়ে গেল সে। এই এক সমস্যা। মন বলছে, দেওয়াই উচিত। কিন্তু বুদ্ধি বলছে, গিফ্‌ট দিলে সেটা একটু আস্পর্ধা হয়ে যাবে। ওর মা-বাবা জানলে নিশ্চয়ই খুশি হবে না। তাদেরই বেতনভুক কর্মচারী গিফ্‌ট দিচ্ছে। এটা ওদের ইগোতে লাগবে।

সে মনকে বোঝাল, আরে বাবা, মিমি অনেক দামি দামি গিফ্‌ট পায়, আমি আর ওকে কী-ই বা দিতে পারি? যাকগে বাবা, নতুন চাকরি, তার মধ্যে কমপ্লিকেশন ডেকে আনা ঠিক হবে না।

গাড়িটাকে সে খুব যত্ন করে। কিউট, নতুন, ঝকঝকে ছোট গাড়ি। রং স্টিল গ্রে। আজ অবধি ঘষা-টষা লাগায়নি সে। খুব সাবধানে

চালায়। নতুন গাড়িতে ঘষা-টষা লাগা মালিকরা মোটে ভাল চোখে দেখে না।

গাড়িটা ঝাড়ন দিয়ে মুছে সে স্টিয়ারিংয়ের ওপর বই খুলে বসে পড়তে লাগল। হাতে লম্বা সময়।

স্কুলে ক্লাস করতে পারলে তার সুবিধে হত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। মাস্টারমশাইরা অবশ্য তার অবস্থাটা বুঝেছেন। তাঁদের কথা হল, তেমন অসুবিধে হলে মাঝে মাঝে এসে পড়া বুঝে নিয়ে যাস। তাই করে আয়ুষ্মান।

দুপুরে নিতান্ত সস্তা দোকানে খেতে গেলেও এত পয়সা বেরিয়ে যায় যে, ফতুর হওয়ার জোগাড়। তাই বাড়ি থেকে রুটি-তরকারি নিয়ে আসে। রুটি যাতে শক্ত হয়ে না যায়, তার জন্য মা আটার সঙ্গে একটু ছাতু মিশিয়ে দেয়। তাতে রুটি নরম থাকে। সঙ্গে বেশির ভাগ দিনই আলু আর কুমড়োর তরকারি। তারপর এক বোতল জল খেয়ে নিলেই পেট ঠান্ডা।

ভেবে দেখতে গেলে, এই নতুন চাকরিতে বেশ ভালই আছে আয়ুষ্মান। কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। পিসফুল লাইফ। রবিবার দিনটা তার ছুটি। কিন্তু ছুটির দিনটাই তার ঝাড় হয়ে যায়। ওইদিন বাড়তি রোজগারের জন্য সে হয় ট্যাক্সি চালায়, নয়তো প্রাইভেট গাড়ি। পুল ড্রাইভার এজেন্সিতে তার নাম লেখানো আছে। সেখান থেকেও বুকিং দেয়। অনেক সময়েই লং ডিসট্যান্স যেতে হয়। দুর্গাপুর, আসানসোল, দিঘা, ধানবাদ, বনগাঁ, হলদিয়া।

গত রোববার গোপালবাবুর গাড়ি চালাতে হয়েছিল। নামী ব্র্যান্ডের সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িটা কেনার আগে গাড়িটার কন্ডিশন দেখতে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন গোপালবাবু। গাড়ির কন্ডিশন খুব ভাল। দু'বছরে মাত্র সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার চলেছে। সামান্য কিছু গড়বড় ছিল। একটু মেরামতি করিয়ে নিলেই হয়। তার কথাতেই গাড়িটা কিনেছিলেন গোপাল সেন। ড্রাইভারও ঠিক করে

দেয় আয়ুষ্মান। তার একটু সিনিয়র বন্ধু পরাশর।

গোপাল সেন তাকে ডেকে বললেন, পরাশরের মায়ের অসুখ। দু'দিনের জন্য দেশে গেছে। রোববার তো তোর ছুটি। আমার স্ত্রী একটু বেরোবেন। তুই যদি চালিয়ে দিস।

আয়ুষ্মান গোপালবাবুর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি। যে-বুকিংটা ছিল তা ক্যানসেল করে দিল।

গোপাল সেনের বউ নন্দিনী সেনকে সে ভালই চেনে। ফিল্মস্টারের মতো চেহারা। গোপাল সেনের সঙ্গে মানায় না। টুকুস বলেছিল, ওই মহিলার চরিত্র কিন্তু ভাল নয়।

কী করে বুঝলি?

ও বোঝা যায়। মেয়েদের ব্যাপার মেয়েরাই বোঝে।

সুন্দরী হলেই তো আর চরিত্র খারাপ হয় না।

সে কথা তো বলিনি। তোর মতো বুদ্ধুকে সব কথা বোঝানোই তো একটা ঝঞ্ঝাট। তোর বুঝে কাজও নেই।

গাড়িটা সারিয়ে নেওয়ার পর এখন দারুণ চলছে। মাখনের মতো।

নন্দিনী ম্যাডাম এগারোটায় নামলেন। গাড়িতে উঠেই তার দিকে চেয়ে বললেন, তোমাকে চেনা-চেনা লাগছে না?

হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি কাছেই থাকি। একসময়ে আমার ট্যাক্সিতে —

হ্যাঁ তো! তুমি আয়ুষ্মান। তাই না? কী সুন্দর নামটা? তুমি সেই মাধ্যমিকে স্টার পেয়েছিলে না?

আর লজ্জা দেবেন না ম্যাডাম। আমিই আয়ুষ্মান।

ওমা! লজ্জা কীসের? মাধ্যমিকে স্টার পাওয়া কি লজ্জার ব্যাপার? পড়াশুনো করছ তো?

হ্যাঁ ম্যাডাম। হায়ার সেকেন্ডারি।

তুমি তো বোধহয় সুমিতদার গাড়ি চালাও, না?

হ্যাঁ ম্যাডাম।

ওরা খুব ভাল লোক, তাই না?

হ্যাঁ ম্যাডাম।

গাড়িটা বের করে এনে আয়ুষ্মান জিজ্ঞেস করল, কোনদিকে যাবেন ম্যাডাম?

পার্ক সার্কাসের দিকে। ব্রেবোর্ন কলেজের সামনে থেকে একজনকে তুলতে হবে।

ঠিক আছে ম্যাডাম।

রুমিদি বলছিলেন তোমার হাত নাকি খুব ভাল।

আয়ুষ্মান হেসে বলে, সাবধানে চালাই তো! তাই হয়তো বলেছেন। পরাশরদাও ভাল চালায় ম্যাডাম।

তা চালায়। তবে পরাশর কিন্তু মদ খায়, জানো?

না ম্যাডাম। আমার জানা ছিল না।

একদিন আমি গন্ধ পেয়েছি। মদ খেয়ে গাড়ি চালানো কি উচিত?

না ম্যাডাম। আমি পরাশরদাকে বলে দেব।

আমিও বলেছি। প্রথমে স্বীকার করছিল না। পরে ক্ষমা-টমা চেয়ে নেয়। বলে দিয়েছি, আর কোনওদিন গন্ধ পেলে সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে দেব।

আমিও সাবধান করে দেব।

তুমি কি জিম করো? বেশ চেহারা তো তোমার!

হ্যাঁ ম্যাডাম। এখন তো তেমন সময় পাই না। ডিউটির পর রাতের দিকে খানিকটা করি।

তুমি বেশ লম্বা, না? ছ'ফুট?

হ্যাঁ ম্যাডাম। পাক্কা। আধ ইঞ্চি কম।

ছোট গাড়ি চালাতে অসুবিধে হয় না?

হয় ম্যাডাম। অ্যাডজাস্ট করে নিতে হয়। অভ্যাস হয়ে গেছে।

কিন্তু গাড়ি চালিয়েই তো জীবন কাটবে না। এরপর কী করবে? জয়েন্ট এন্ট্রাস?

এখনও ঠিক করিনি। জয়েন্টে চান্স পেলে ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার অনেক খরচ।

মেরিটোরিয়াস ছেলেমেয়েদের তো অনেকে স্কলারশিপ বা গ্র্যান্টও দেয়। তোমাদের গোপালবাবুকে বোলো। ওর হাতে অনেক বড় বড় ক্লায়েন্ট আছে।

জয়েন্টে চান্স পেলে বলব ম্যাডাম।

জয়েন্ট দিয়ো। স্কিপ কোরো না।

এইসব কথাবার্তায় আয়ুষ্মানের মনটা বড় ভাল হয়ে গেল। নন্দিনী সেনের চরিত্র খারাপ কি না তা সে জানে না। তবে ভদ্রমহিলাকে তার ভীষণ ভাল মনের মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। সুইট পারসোনালিটি। একজন ফুরনের ড্রাইভারকে এতটা গুরুত্ব কে দেয়?

রোববারের নির্জন ফুটপাথে ব্রেবোর্ন কলেজের সামনে যে-লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল, তার পরনে নীল জিনস, গায়ে সাদা হাওয়াই শার্ট, পায়ে স্নিকার, চোখে রোদচশমা। লোকটার গায়ের রং কালো, মাঝারি, লম্বা, কেঠো পাকানো চেহারা, মাথায় চুল কম। বয়স চল্লিশের ওপরে।

নন্দিনী ম্যাডাম ঝুঁকে সামনেটা লক্ষ করছিলেন। লোকটাকে দেখতে পেয়েই বললেন, হ্যাঁ, ওই লোকটার কাছে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাও। আর কাচটা নামিয়ে দাও।

গাড়িটা থামতেই লোকটা চশমা খুলে এগিয়ে এসে পেছনের জানালায় নিচু হয়ে বলল, সেন ম্যাডাম তো?

নন্দিনী বলল, আপনিই বাবু?

হ্যাঁ ম্যাডাম।

উঠে আসুন।

লোকটা উঠে দরজা বন্ধ করে দিল। চশমাটা খুলে বুকপকেটে ঢুকিয়ে রাখল, শুধু একটা ডাঁটি বেরিয়ে রইল বাইরে। বেশ দামি কোনও কোলন মেখেছে। গাড়িটা সুগন্ধে ভরে গেল।

কিন্তু ধপধপে সাদা শার্ট, ঝকঝকে নীল প্যান্ট, দামি স্নিকার বা সুগন্ধ এগুলো দিয়ে সব কিছু ঢাকা যায় না। আয়ুষ্মান লোকটাকে দেখেই ভীষণ একটা অস্বস্তি বোধ করল। কারণ একেবারে শিশুকাল থেকে সে ক্রিমিনাল দেখে দেখে বড় হয়েছে। তাদের পাড়াটাই ক্রিমিনালদের বীজতলা। বাবু নামক এই লোকটার চোখের দিকে একপলক তাকালেই বুঝতে দেরি হয় না যে, এই লোকটি বিপজ্জনক। এ যে ছোট মাপের ক্রিমিনাল নয়, তা অদৃশ্য অক্ষরে এর সর্বাঙ্গে লেখা আছে। যে-ক'জন খুনিকে আয়ুষ্মান জীবনে দেখেছে, তাদের চোখে একটা অস্বাভাবিক তীব্রতা লক্ষ করেছে। এর চোখও হুবহু তাই। এইরকম একটা লোক ম্যাডামের সঙ্গে জুটল কী করে, তার মাথায় এল না।

নন্দিনী বলল, আয়ুষ্মান, সিটি সেন্টার চলো। চেনো তো?

চিনি ম্যাডাম।

আশ্চর্যের বিষয়, সিটি সেন্টার পর্যন্ত বাকি রাস্তাটা নন্দিনী আর কথাই বলল না। চুপচাপ ডান দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। আর বাবু নামের লোকটাও চুপচাপ বাঁ দিকের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে বসে রইল। দু'জনের মাঝখানে নন্দিনীর বড়সড় হ্যান্ডব্যাগটা। দেখে মনে হল যেন কেউ কাউকে চেনেই না।

সেই যে মনটা খচখচ করা শুরু করল তা আজ অবধি আছে। নন্দিনী সেন একজন অভিজাত ভদ্রলোকের বউ। স্মার্ট, শিক্ষিতা, সুন্দরী। তাঁর সঙ্গে এরকম লুচ্চা টাইপের বাজে লোকের কী দরকার থাকতে পারে? লোকটা সুপারি কিলার, ব্ল্যাকমেলার, এলাকার ডন হলেও হতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই নয়। যথেষ্ট ভদ্রলোক সাজলেও বা কোলন মাখলেও এর গা থেকে অবিসংবাদী ক্রিমিনালের বাচ্চাই বেরিয়ে আসছে।

সিটি সেন্টারে দু'জনেই নেমে গেল। নন্দিনী বলল, তুমি গাড়িটা

পার্ক করে বসে থাকো, আমি সময়মতো তোমাকে মোবাইলে ডেকে নেব।

ঠিক আছে ম্যাডাম।

পার্কিং লট-এ গাড়িটা পার্ক করে বেশ খানিকটা উদ্বিগ্ন মনে বসে রইল আয়ুষ্মান। তার কি উচিত ছিল নন্দিনী ম্যাডামের সঙ্গে সঙ্গে থাকা? যদি কোনও বিপদ হয়? বাবু একজন অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক, এটা হয়তো নন্দিনী ম্যাডাম জানেন না। লোকটা কি ম্যাডামকে ব্ল্যাকমেল করছে? বা অন্য কোনও জালে বা ফাঁদে ফেলতে চাইছে?

একবার তার ইচ্ছে হল গোপাল সেনকে ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়। অবশ্য সে কিছুই করল না। চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল। বিপদ ঘটবার আগেই বিপদ কল্পনা করে কিছু করলে ব্যাপারটা অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

ক্রিমিনালরা যে সবসময়ে শুধু ক্রাইমই করে বেড়ায় এমন তো নয়। অনেক সময়ে তাদের একটা সামাজিক জীবন থাকে, সমাজে দেখানোর মতো মুখও থাকে। এ লোকটা হয়তো ম্যাডামকে ফিল্ম-এ চান্স করে দেবে। কিংবা বিউটি কনটেস্টে নামাবে। এমনকী মডেলিং-এর অফারও দিতে পারে। আর সিটি সেন্টারের মধ্যে তেমন কোনও বিপদ হওয়ার কথাও নয়।

সুতরাং আয়ুষ্মান উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করল, শান্ত হয়ে বসল। তবে ঠিক করে রাখল ফেরার সময়ে লোকটা গাড়িতে ওঠার আগেই মোবাইলে ওর একটা ছবি তুলে রাখবে। ছবি থাকলে লোকটা আসলে কে, তা বের করা শক্ত হবে না। তার পাড়াটাই ক্রিমিনালদের পাড়া। ওরা সব ক্রিমিনালদেরই চেনে।

ঘণ্টাখানেক পরে ম্যাডামের ফোন এল, চলে এসো। আমি গেটে দাঁড়িয়ে আছি।

গাড়িটা নিয়ে যখন সামনের রাস্তাটায় ঢুকছিল, তখন দূর থেকেই দেখল ম্যাডাম আর বাবু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মোবাইলটা

তৈরিই ছিল তার। জানালা দিয়ে হাতটা বার করে পরপর দুটো ছবি তুলে ফোনটা লুকিয়ে ফেলল।

এবার ম্যাডাম একাই গাড়িতে উঠলেন। লোকটা উঠল না।

উনি উঠবেন না ম্যাডাম?

না, ওর কাজ আছে। পার্ক স্ট্রিট চলো।

ঠিক আছে ম্যাডাম।

চোখের ভুল কি না কে জানে, তবে গাড়িতে ওঠার পর নন্দিনীর মুখটা যেন একটু সাদা দেখাচ্ছিল। ভয়ে বা দুশ্চিন্তায় যেমন হয়। সেদিন তেমন গরম ছিল না, গাড়ির এসি চালু ছিল। তবু ম্যাডাম রুমালে মুখের ঘাম মুছলেন বারবার।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ আপনা থেকেই বললেন, ও লোকটা আমার এক দাদার বন্ধু। জমি আর বাড়ির দালালি করে। আমার বাবা তো কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট বা বাড়ি কিনতে চাইছেন। তাই কথা হচ্ছিল।

আয়ুষ্মান শুধু বলল, ও।

কথাটা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল। হয়তো তার অনুমানেরই ভুল। লোকটা হয়তো সত্যিই ক্রিমিনাল নয়। কিংবা কোনও সময় ছিল, এখন শুধরে গিয়ে সামাজিক জীবন যাপন করছে। কিন্তু মনের খচখচানিটা থেকেই গেল।

পার্ক স্ট্রিটের একটা ঘ্যামা বিউটি পার্লারে ম্যাডাম নামলেন। নামবার আগে একটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, অনেক বেলা হয়েছে, কিছু খেয়ে নিয়ো। আমার দেরি হবে।

আমার সঙ্গে খাবার আছে ম্যাডাম।

কী আছে?

রুটি-তরকারি।

নন্দিনী হেসে ফেলে বলল, আচ্ছা আচ্ছা, তার সঙ্গে না হয় এক প্লেট মাংস বা আইসক্রিম খেয়ে নিয়ো।

টাকাটা নিল আয়ুষ্মান। পার্ক স্ট্রিটে একশো টাকাও গরিব টাকা, ভ্যালু নেই। যে-পাড়ায় একশো টাকাকে একশো টাকা বলেই মনে হবে, সেখানে গিয়ে বের করবে। এই ভেবে টাকাটা পকেটে রেখে দিল সে।

বিউটি পার্লার মানেই বিশাল ব্রেক। বাইরে থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ভেতরে ভিড় আছে। সুতরাং আয়ুষ্মান ধীরেসুস্থে রুটি-তরকারি খেল। সামনে পার্ক করা একটা দামি বিদেশি গাড়ির উর্দি-পরা ড্রাইভারের সঙ্গে হিন্দিতে খানিকক্ষণ আড্ডা দিল সে। একটা ম্যাগাজিন স্টলে দাঁড়িয়ে ছবিওয়ালা একটা ইংরিজি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাল।

তিন ঘণ্টা পরে নন্দিনী বেরিয়ে এলেন। চেহারায় একটা বেশ চেঞ্জ এসেছে। সেটা ভাল হয়েছে না মন্দ তা বুঝবার সাধ্য আয়ুষ্মানের নেই। সে শুধু বুঝল, ম্যাডামকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

নন্দিনী গাড়িতে উঠে বললেন, সোজা বাড়ি যাব। তারপর তোমার গোপালবাবুকে নিয়ে গল্ফ ক্লাবে, একটা পার্টিতে।

আজও বাবুর ফোটো তার মোবাইলে রয়েছে। কিন্তু কাউকে দেখাতে পারেনি আয়ুষ্মান। কারণ ছবিতে বাবুর সঙ্গে নন্দিনীর ছবি উঠে গেছে। কাউকে দেখালেই প্রশ্ন উঠবে, মহিলাটি কে! সেটা চায় না আয়ুষ্মান। তাই বাবুর আসল আইডেনটিটি তার আজও জানা নেই। শুধু সন্দেহটা রয়েছে। নন্দিনী ম্যাডামের মতো কোনও ঘ্যামা মহিলার সঙ্গে বাবুর মতো কোনও লোককে ঠিক প্লেস করা যায় না। দালাল হলেও বাবু ক্রিমিনাল গোত্রের মানুষ।

সন্ধেবেলা বাড়িতে ফিরে বাবলুকে ডেকে চকোলেটের বারটা দিল আয়ুষ্মান। বাবলুর মুখে যে-হাসিটা ফুটল, তা যেন স্বর্গের বাগানে একটা ফুল।

কে দিল রে দাদা? না তুই কিনলি?

একজন দিয়েছে। রাখির গিফ্‌ট।

রাখি দেখে চোখ বড় করে চাইল টুকুস, তোকে পরাল?

হ্যাঁ তো।

দারুণ দামি রাখি! একশো টাকার ওপরে দাম।

এবার তুই নিশ্চিন্ত তো! রাখি যখন পরিয়েছে আর ভয় নেই।

টুকুস হাসল। বলল, ঠাট্টা করছিলাম। তোর মুরোদ তো জানি।

সেদিন বৃহস্পতিবার। সকালে ডিউটিতে যেতেই রুমি ম্যাডাম বললেন, শোনো জোয়ার, আজ একটু রাত পর্যন্ত ডিউটি দিতে হবে। আজ আমার ভাই গোপালের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। মিমির বাবার স্পন্ডেলাইটিসের প্রবলেমটা বেড়েছে। উনি গাড়ি চালাতে পারবেন না।

ঠিক আছে ম্যাডাম। আমার কোনও অসুবিধে নেই।

বাঁচলুম।

বিকেলে মিমিকে স্কুল থেকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পর অপেক্ষা করল আয়ুষ্মান। আটটা নাগাদ সেজেগুজে তিনজন নেমে এল নীচে।

গোপালবাবুর বাড়িতে সওয়ারি নামিয়ে সে দেখল, পার্ক করার জায়গা-ই নেই। আজ বিস্তর গাড়ির আমদানি হয়েছে।

তবে এটা তারই পাড়া। অন্ধি-সন্ধি সে সব জানে। শীতলা মন্দিরের পাশে একটা কানাগলি আছে। জায়গাটা অন্ধকার। তবে নিরাপদ। গাড়িটা একটু ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে আচমকা তার চোখ পড়ল একটা মোটরবাইকের ওপর। খুব ধীর গতিতে এসে উলটোদিকের দুটো গাড়ির মধ্যেকার ফাঁকে সেটা দাঁড় করাল হেলমেটধারী লোকটা। পরনে নীল জিনস, তবে গায়ে একটা কালচে জামা। কেমন যেন সন্দেহ হল আয়ুষ্মানের, ফিগারটা চেনা। পায়ের হলুদ আর সাদা স্নিকারটাও সে দিব্যি চিনতে পারছে। বাঁ হাতের কবজির ঘড়িটাকেও মনে পড়ে গেল তার। বেশ বড়সড় মাল্টি-ডায়াল ঘড়ি।

হতেও পারে বাবু এ বাড়িতে আমন্ত্রিত। বাড়ির বিশাল ছাদে

প্রকাণ্ড প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে। বহু লোকেরই নেমন্তন্ন। এমনকী আয়ুষ্মানেরও। বাবুরই নেমন্তন্ন হতে বাধা কোথায়?

বাবু অবশ্য মোটরবাইক থেকে নামল না। হেলমেটটাও খুলল না। হেলমেটের স্ক্রিনের ভেতর দিয়ে টুনি বাল্‌ব-এ সাজানো বাড়িটা দেখছিল। তারপর হঠাৎ বাইকে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল না আয়ুষ্মান। গাড়িটা নিয়ে শীতলা মন্দিরের গলিতে পার্ক করে টুকুসকে ফোন করল।

শোন, আমার ফিরতে দেরি হবে।

কেন?

ওভারটাইম করছি। তবে পাড়াতেই আছি।

কোথায় আছিস?

গোপাল সেনের ফ্ল্যাটবাড়ির কাছে। আজ ওদের বিবাহবার্ষিকী। আমারও নেমন্তন্ন। রাতে আমার রুটি করিস না। নেমন্তন্নর পর সুমিতবাবুদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরব।

বিবাহবার্ষিকী?

হ্যাঁ।

ভ্যাট! ভাদ্র মাসে কি বিয়ে হয়?

এটা ভাদ্র মাস নাকি?

ভাদ্র মাস নয়তো কী? আজ ভাদ্র মাসের বারো তারিখ।

ভাদ্রে বিয়ে হয় না কে বলল?

সবাই জানে। তুই তো হাঁদারাম, তাই খবর রাখিস না।

তবে গোপালবাবুর হল কী করে?

তার আমি কী জানি!

তাহলে বোধহয় রেজিস্ট্রি বিয়ে।

রেজিস্ট্রি বিয়ে আবার একটা বিয়ে নাকি? তার আবার বিবাহবার্ষিকী কীসের? সাত পাক না হলে কি বিয়ে হয়?

কিন্তু খুব ঘটাপটা করে হচ্ছে। ছাদে বিশাল প্যান্ডেল।

হোকগে। ওই বিবাহবার্ষিকীর নেমন্তন্ন তোকে খেতে হবে না। পেটে সইবে না।

দেখ টুকুস, তোর কথা কিন্তু ভীষণ ফলে যায়! দিলি তো আমার নেমন্তন্নের বারোটা বাজিয়ে! এখন বাড়ি ফিরে শুকনো রুটি গিলতে হবে।

আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। আমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। পেট ভরে ভালমন্দ খেয়ে আসিস। কিচ্ছু হবে না।

মন থেকে বললি তো!

হ্যাঁ রে হ্যাঁ। রেজিস্ট্রি বিয়ে শুনলেই আমার গা-পিত্তি জ্বলে যায়।

তাহলে খাচ্ছি কিন্তু!

হ্যাঁ, পেট ভরে খাস।

ফোনটা কেটে স্পটটা আবার দেখল আয়ুষ্মান। মালটা হঠাৎ কেটে পড়ল কেন, তা সে বুঝে উঠতে পারল না। ফোনটা বের করে বাবুর ফোটোটার দিকে একটু চেয়ে রইল। পাশেই নন্দিনী। ভ্রু কুঁচকে কী করা যায়, তা একটু ভাবল সে। ফোনটা অ্যান্ড্রয়েড টাচ ফোন। সম্ভবত টাচ-এ জুম করা যায়। কয়েকবার চেষ্টা করতেই পট করে বাবুর ছবিটাই স্ক্রিন জুড়ে দেখা গেল। নন্দিনী ফ্রেমের বাইরে।

সে দ্রুত হেঁটে তাদের ক্লাবে হাজির হয়ে দেখল, দু'ধারে দুটো বোর্ডে ক্যারম খেলা চলছে। পেছনে একটা টেবিলে ব্রিজ। টেবিল ঘিরে দাঁড়ানো কয়েকজন। তাদের মধ্যেই কালুকে পেয়ে গেল আয়ুষ্মান। কালু একসময়ে তার সহপাঠী ছিল। পরে ড্রপ-আউট হয়ে ভাগ্যান্বেষণে কিছুদিন স্মাগলিং করে। এখন দুটো অটো। আগে নিজে চালাত। এখন ভাড়ায় দিয়ে দিয়েছে। নিজে এখন একটা ইলেকট্রনিক্স আর মোবাইলের দোকান খুলেছে।

কালুকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে ছবিটা দেখাল।

চিনিস?

এ মালকে কোথায় পেলি? এ তো গুল্লে বাবু।

তার মানে?

ডেনজারাস জিনিস।

গুল্লে বাবুটা আবার কীরকম নাম?

বাবু দাস। মিলিটারিতে ছিল একসময়ে। আরলি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে চলে এসেছে। বন্দুক-পিস্তলে দারুণ হাত।

করে কী?

তিন-চারটে ডাকাতি করেছে জানি। আসলে সুপারি কিলার। এসব লাইনে না এলে শুটার হিসেবে নাম করতে পারত। হাতের টিপ খুব পরিষ্কার। গুলি চালাতে ওস্তাদ বলেই ওর ওই নাম। গুল্লে বাবু।

ঠিক জানিস সুপারি কিলার? জমির দালাল নয় তো?

পাগল নাকি? জমির দালালি করবে বাবু দাস? কোথায় পেলি ওকে?

একটু আগে ওই হাইরাইজ়টার সামনে দেখেছিলাম। মোটরবাইকে বসে আছে।

তাহলে কারও কপালে দুঃখ আছে।

কী করা যায় বল তো?

কী করতে চাস? ধরে পুলিশে দিবি? লাভ নেই। কারণ ও পুলিশের হয়েও কাজ করে। কখনও কখনও পুলিশ বা প্রশাসনেরও দরকার হয় কাউকে কাউকে এলিমিনেট করার। আন্ডারওয়ার্ল্ড বা পলিটিক্যাল কাউকে। বাবু সেটা করে দেয়। পুলিশ ওকে ছোঁয় না। কিন্তু তোর টেনশন কীসের?

তোকে পরে বলব।

তোর এসব এলিমেন্ট নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী? মাধ্যমিকে স্টারে পৌঁছিয়েছিস, মন দিয়ে লেখাপড়া কর। আন্ডারওয়ার্ল্ডকে তার মতো থাকতে দে।

বাবু খুন করতে কত টাকা নেয়?

পাঁচ থেকে দশ লাখ। ভিআইপি হলে পঞ্চাশ লাখ অবধি।

কখনও ধরা পড়েনি?

বহুবার। ধরা পড়েই ছাড়া পেয়ে যায়। বললাম তো, বাবু হল ফ্রি অ্যাজ় এয়ার। বাবু দাসের চিন্তা মাথা থেকে তাড়িয়ে দে।

কিন্তু বাবুর চিন্তাটা মাথা থেকে তাড়াতেও পারল না আয়ুষ্মান। তার খটকা বাবুকে নিয়ে নয়। গুন্ডা বা খুনে সে বিস্তর দেখেছে, তাদের পাশাপাশিই তার বাস। তার খটকা হল ম্যাডামকে নিয়ে। নন্দিনীর সঙ্গে বাবুকে মেলাতে পারছে না সে। ঘাপলাটা কী?

সামনের রাস্তাটা গাড়িতে গিজগিজ করছে। ভাবল পার্কিং-এর ফলে একটু জ্যামও হয়েছে। পুরো তল্লাটটা বারবার ঘুরে বেড়াল আয়ুষ্মান। কিন্তু বাবু বা তার মোটরবাইককে দেখা গেল না। এগিয়ে গিয়ে দাশনগরের গলি, চালপট্টিও ঘুরে এল সে। যদি অন্ধকারে চোখের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকে। দেখতে পেলেও সে তো আর বাবুকে কিছু করতে পারবে না। তবে চোখে চোখে রাখবে। মতলবটা বোঝার চেষ্টা করবে।

কিন্তু তার এত মাথাব্যথা কীসের? এই প্রশ্নটাও তার একসময়ে মাথায় এল। সে কেন বাবু আর নন্দিনীর সম্পর্ক নিয়ে এত উদ্বেগ বোধ করছে? ভেবে দেখতে গেলে এরা তো তার কেউই নয়। নিতান্তই ক্যাজুয়্যাল সম্পর্ক। নন্দিনী ম্যাডামের প্রতি সে দুর্বল হয়ে পড়েনি তো! সেদিন তার চেহারার খুব প্রশংসা করছিল নন্দিনী ম্যাডাম। কথাটা ভাবতেই ভেতরে ভেতরে সে শরীরে একটা রক্তোচ্ছ্বাস টের পেল। কানদুটো হঠাৎ গরম। একটা মৃদু শিহরন। নন্দিনীর মুখখানা আজকাল তার বারবার মনে পড়ে। কারণে-অকারণে, পাতলা, ছিমছাম গড়ন, ফরসা, ঠিক যেন ফিল্মস্টার। কোনও বিপদ হলে নন্দিনী ম্যাডামকে বাঁচানোর জন্য সে প্রাণও দিতে পারে বোধহয়।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ টুকুসের ফোন এল, দাদা, কী করছিস?

এই তো। ডিউটি করছি।

খেয়েছিস?

না। শেষ ব্যাচে খাব।

দেরি করছিস কেন বল তো!

আরে, এখনও মেলা গেস্ট রয়েছে যে।

একটু আগে কালুদা বলে গেল, তুই নাকি বাবু নামে কার যেন খোঁজখবর করছিস! সত্যি নাকি?

আরে, ওটা কিছু নয়। জাস্ট একটা কৌতূহল।

ওসব গুন্ডা-বদমাশদের খোঁজখবরে তোর কী দরকার?

কোনও দরকার নেই। লোকটা এখানে ঘোরাফেরা করছিল বলে সন্দেহ হয়েছিল।

তোর মোবাইলে ওর ছবি এল কী করে?

তুলেছিলাম।

কবে?

ঠিক মনে নেই কবে। তবে লোকটার চেহারা দেখে মনে হল ক্রিমিনাল। তাই ছবি তুলে রাখি।

যদি টের পেত যে, তুই ওর ছবি তুলছিস?

টের পায়নি। আমি কি অত বোকা নাকি?

তুই কিন্তু ভীষণ বোকা, সেটা তুই জানিস না।

অত ভাবছিস কেন? আমি তো আর রংবাজি করছি না!

এখন তুই গিয়ে খেয়ে নে তো। তারপর ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরে আয়। কোনও বীরত্ব দেখানোর দরকার নেই।

যাঃ বাবা। বীরত্ব আবার কোথায় দেখালাম!

তোর মতলব আমার ভাল বলে মনে হচ্ছে না। বড্ড বাড় বেড়েছিস। তুই নাকি কালুদাকে বলেছিস, বাবুকে কী করে ঢিট করা যায় বল তো!

হ্যাঁ। আরে ওটা কিছু নয়। অ্যাকশনের কথা বলিনি।

মানেটা তো তাই দাঁড়াচ্ছে। বাবু এ পাড়ায় এসেছে বলেই তোকে কিছু করতে হবে কেন? সে তো অন্য কাজেও এসে থাকতে পারে!

সে তোকে কামড়েছে না খিমচেছে?

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আয়ুষ্মান জানে টুকুসের আদেশ অলঙ্ঘ্য। সে বলল, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে বাবা। আমি সারেন্ডার করছি। এখন আমি ভাল ছেলের মতো খেতে চলে যাচ্ছি।

তাই যা। মনে থাকে যেন!

লিফটে ওপরে উঠে খাওয়ার জায়গায় ঢুকে একটু সংকোচ বোধ করছিল সে। ঘ্যামা ঘ্যামা মেয়ে-পুরুষেরা বসে খাচ্ছে। আলাদা আলাদা টেবিল ঘিরে চেয়ার, একধারে বুফের ব্যবস্থা। এই নিজে নিজে নিয়ে খাওয়া ব্যাপারটায় তার খুব বাধো বাধো ঠেকে। তাদের পাত পেড়ে খাওয়ার অভ্যেস। ঢুকেই একটু থমকে গেল সে। একবার ভাবল, খেয়ে দরকার নেই বাবা। বাড়ি ফিরে যা হোক কিছু খেয়ে নিলেই হবে।

ঠিক এই সময়ে নন্দিনী এগিয়ে এসে অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, ওমা! আয়ুষ্মান! তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? এসো এসো।

বুকটা ধক করে উঠল আয়ুষ্মানের। শরীরে সেই শিহরন। রক্তে সেই কলরোল। কান সেইরকমই গরম। নন্দিনী ম্যাডাম আজ সেজেছেনও বটে। পরনে একটা পাটকিলে রঙের ঝলমলে শাড়ি। বেনারসি বা বালুচরিই হবে বোধহয়। লিপস্টিক, মেক-আপ, হেয়ার স্টাইলে বয়স দশ বছর কমে গেছে। চোখ চেয়েও বেশিক্ষণ থাকা যায় না। চোখ ফেরানোও মুশকিল।

নিঃসংকোচে একখানা নরম হাতে তার হাত ধরে ম্যাডাম তাকে টেনে নিয়ে গেলেন। নিজেই হাতে প্লেট তুলে দিলেন আর খাবার।

কী খাবে বলো তো! তোমার বয়সি ছেলেরা তো খুব মাংস ভালবাসে, তাই না?

বিরিয়ানি, ফিশ ফ্রাই, মুরগিতে প্লেট স্তূপাকার হয়ে গেল। সে সসংকোচে বলল, আর না ম্যাডাম, অনেক হয়েছে।

এসো তো, ওই পাখার তলায় বসে খাও। পেট ভরে খেয়ো কিন্তু। আমি নজর রাখব।

তার আবার মনে হল, হ্যাঁ, নন্দিনী ম্যাডামের জন্য সে প্রাণ দিতে পারে।

টেবিলটা একরকম ফাঁকাই। উলটোদিকে একজন বুড়ো মানুষ বসে আছেন, পাশে বোধহয় তাঁর বছর পাঁচেকের নাতনি। আয়ুষ্মানকে আড়ে আড়ে দেখছিলেন।

কিন্তু আয়ুষ্মান উত্তেজনায় খাবারের তেমন স্বাদ পাচ্ছিল না। বুকটা ধক ধক করছে এখনও। নন্দিনী ম্যাডাম তার হাতটা ধরেছিলেন, হাতটা শরীর থেকে যেন আলাদা বলে মনে হচ্ছে।

খাবারের স্বাদ পাচ্ছিল না আয়ুষ্মান। প্যান্ডেলটা তার কাছে যেন একটা নানা রঙের ধাঁধার মতো দেখাচ্ছে। তার শ্বাস গাঢ় হয়ে উঠেছে। সে নিজের বশে নেই।

মাথা নিচু করে সে অসহায়ের মতো ভাবছিল। কেন নন্দিনী ম্যাডামের সঙ্গে তার এত দূরত্ব? সে মাত্র একুশ প্লাস, নন্দিনী ত্রিশ-বত্রিশ। সে বলতে গেলে বস্তির ছেলে আর ম্যাডাম উঁচু স্ট্যাটাসের, সে মাত্র হায়ার সেকেন্ডারি আর ম্যাডাম হয়তো বি এ, এম এ। তারপরও আছে। ম্যাডাম পরস্ত্রী, গোপাল সেনের বউ। তার যে ভীষণ ইচ্ছে করছে ম্যাডামের পায়ের তলায় পড়ে থাকতে। ম্যাডামের হাতটা একটু ছুঁয়ে থাকতে। ম্যাডামের কাছাকাছি চুপচাপ বসে থাকতে। কেন যে ম্যাডাম এত দূরে! কাছে যেতে হলে তাকে কি প্রশান্ত মহাসাগর সাঁতরে পার হতে হবে?

সুমিতবাবুদের যখন বাড়িতে পৌঁছতে যাচ্ছিল আয়ুষ্মান তখনই বুঝল তার রিফ্লেক্স কাজ করছে না। অভ্যাসবশে গাড়ি চালিয়ে নিচ্ছে মাত্র। কিন্তু মাঝে মাঝেই স্পিড তুলে ফেলছে, যা সে কখনও করে না। সে জানে, মালিকের গাড়ি সবসময়ই সাবধানে চালানোর নিয়ম। গাড়িতে কোনও চোট হলে মালিক খুশি হয় না। সে সবসময়েই

সাবধানে চালায়। কিন্তু আজ সে নিজের বশে নেই।

রুমি ম্যাডাম পেছন থেকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ঠিকমতো খেয়েছ তো জোয়ার?

হ্যাঁ ম্যাডাম।

মিমি বলল, জোয়ারদা, তোমার নাম নাকি জোয়ার নয়, আয়ুষ্মান?

হ্যাঁ। গোপাল স্যার আমার কোষ্ঠী দেখে বলেছেন আমার নামের আদ্যক্ষর নাকি বর্গীয় জ হওয়া উচিত। নামটা উনিই পালটে দিয়েছেন।

রুমি ম্যাডাম বললেন, ওমা! আয়ুষ্মান নামটাও তো খুব সুন্দর!

সুমিত স্যার সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছেন। হঠাৎ বললেন, ওর সঙ্গে বেশি কথা বোলো না। গাড়ি চালানোর সময় বেশি কথা বললে কনসেনট্রেশন থাকে না।

আয়ুষ্মান টের পায়, কোনও অজ্ঞাত কারণে সুমিত স্যার তাকে বিশেষ পছন্দ করেন না। তার ভাগ্য ভাল সুমিত স্যারের সঙ্গে তার বিশেষ দেখা হয় না। সে ওদের দ্বিতীয় গাড়িটা চালায়। প্রথম গাড়িটা সুমিত স্যার নিজেই চালান।

ফেরার সময় ফাঁকা বাসে বসে আয়ুষ্মান চোখ বুজে তার প্রগাঢ় সম্মোহনে ডুবে ছিল। চোখের সামনে শুধু একটাই মুখ। নন্দিনী ম্যাডাম। নেশাখোরের মতো এক অবস্থা তার। শরীর বশে নেই, মন স্থির নেই।

বাসরাস্তা থেকে তার বাড়ি অনেকটা হাঁটাপথ। পথটা টেরই পেল না সে। এমনকী চেনা পথে যাচ্ছে, না বিপথে, তাও টের পাচ্ছিল না। শুধু অভ্যস্ত পা তাকে তার নির্ভুল ঠিকানায় নিয়ে এল।

দরজা খুলে টুকুস বলল, খেয়ে এসেছিস তো? নাকি খাবি?

হ্যাঁ। দারুণ খাওয়া।

কোনওরকমে নিয়মরক্ষার মতো হাতে-মুখে জল দিয়ে সে তার

ফোল্ডিং খাটখানা নিয়ে বাড়ির পেছন দিককার কমন প্যাসেজে চলে গেল। তাদের মোটে দু'খানা ঘর আর একটা রান্না-খাওয়ার জায়গা। ঘরে জায়গা হয় না। কমন প্যাসেজটা চওড়া আছে। ওপরে একটু ছাউনি দিয়ে নিয়েছে তারা।

ছয়

অনেক রাতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে খুব ধীরেসুস্থে নন্দিনী তার কানের দুল, হাতের বালা, গলার নেকলেস খুলে রাখছিল। জবরজং শাড়ি আর ব্রোকেডের ব্লাউজ় ছেড়ে সে এখন একটা হালকা নাইটি পরে নিয়েছে। যা গরম লাগছিল ওগুলো পরে। এসব সাজগোজের কোনও মানেই হয় না। যেমন মানেই হয় না তাদের পাঁচ বছরের এই বিবাহবার্ষিকী পালনটারও। এত জাঁকজমক হল, এত লোক নেমন্তন্ন খেল, কত খরচ করল গোপাল। কিন্তু বিয়েটাই কি আর আছে? কনেও পালায়নি, বরও পালায়নি, পালিয়ে গেছে বিয়েটাই। দু'টি মানুষ। একটি নর ও একটি নারী কাঠের মতো দু'জনে দু'জনের কাছাকাছি আছে মাত্র।

মাসখানেক আগে সে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কোনও ডিসিশন নিয়েছ কি?

গোপাল একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, কীসের ডিসিশন?

আমাদের— মানে তোমার আর আমার ব্যাপারে?

তুমি কী চাও?

আমি? আমার তো কোনও বক্তব্য নেই। অজুহাত নেই।

তুমি কি আমার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছ?

আমার কি অন্য কোনও অল্টারনেটিভ আছে?

তা থাকবে না কেন? তবে যদি আমার ওপর নির্ভর করো তাহলে আমাকে একটু সময় দাও।

আমরা কি এক ফ্ল্যাটেই থাকব?

নয় কেন? তবে তোমার এখানে থাকতে ইচ্ছে না করলে অন্য কথা।

আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে কিছু নেই। এখানেও থাকতে পারি।

বেশ তো। নিজেকে অবাঞ্ছিত ভেবো না।

বিবাহবার্ষিকীর ব্যাপারটা নিয়ে যখন কথা উঠল তখন গোপাল বলল, এ বছর পাঁচ পূর্ণ হচ্ছে। সকলেই এক্সপেক্ট করছে এবার একটু ঘটা করে হোক। ছোড়দি বলেছে, তোদের তো সামাজিক বিয়েই হল না। পাঁচ বছরেরটা একটু বিয়ে-বিয়ে যেন মনে হয়।

একটু অবাক হয়ে নন্দিনী বলেছিল, বিবাহবার্ষিকী হবে?

তোমার আপত্তি আছে?

না। কিন্তু লোক-দেখানো ব্যাপার হবে না?

হ্যাঁ। তা হবে। তবে লৌকিকতাও তো দরকার। সমাজ আর সভ্যতা মানেই তো অনেক সত্যকে ঢাকা-চাপা দিয়ে রাখা।

তোমার ইচ্ছে হলে করো। আমার আপত্তি নেই।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল গোপাল তার ওপর রাগ দেখায়নি, শাসন করেনি, চেঁচামেচি তো নয়ই। তার আর বুধাদিত্যর অ্যাফেয়ার জানার পরও এত সংযত এবং শান্ত ব্যবহার করেছে, যা নন্দিনী প্রত্যাশা করেনি। তবে তারা আর স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘনিষ্ঠও নেই। ঘর আলাদা। কথা কম। সম্পর্ক অতি শীতল।

বিয়ে ভাঙার নোটিস গোপাল যে-কোনওদিন দিতে পারে বলে অপেক্ষা করছিল নন্দিনী। কিন্তু সেরকম কোনও উদ্যোগও গোপাল দেখায়নি। কেন, তা জানে না নন্দিনী।

মনে অভিমান, রাগ বা আক্রোশ জন্মালে সময় দ্রুত কেটে যায়। একঘেয়ে লাগে না, কোনও এন্টারটেনমেন্টের দরকার হয় না। মনের জ্বালা-পোড়াও বোধহয় আসলে এক উপভোগ্য ব্যাপার। নইলে নন্দিনীর সময় কি এত অনায়াসে কেটে যেত?

একটা লোককে যতখানি ভালবাসা যায়, ঠিক ততখানিই ঘেন্না করা যে সম্ভব, এটা জানা ছিল না নন্দিনীর। তার মোবাইলে বুধাদিত্যর কয়েকটা ছবি তুলে রেখেছিল— যা সে অবসর সময়ে খুব আদর

করে দেখত— তার সব ক'টাই সে উড়িয়ে দিয়েছে।

কয়েকদিন আগে তার মোবাইলে একটা ফোন এল।

ম্যাডাম, আমার নাম বৈদূর্য ভট্টাচার্য। চিনতে পারছেন?

আপনি আমার অনেক ক্ষতি করেছেন বৈদূর্যবাবু। আপনাকে ভুলি কী করে? কী বলবেন বলুন।

ম্যাডাম, আপনি অনর্থক আমার ওপর রাগ করে আছেন। আমি নিমিত্ত মাত্র। পেটের দায়ে আমাদের কাজ করতে হয়, চয়েস থাকে না।

বুঝেছি। এ কথা আপনি আগেও বলেছেন। নতুন কোনও কথা আছে কি?

ম্যাডাম, আমার মনে হচ্ছে, অনিচ্ছে সত্ত্বেও আমি হয়তো আপনার খানিকটা ক্ষতি করে ফেলেছি। বুধাদিত্যবাবু তাঁর নিজের পেছনেই ডিটেকটিভ লাগিয়েছিলেন। এসব ক্ষেত্রে ধরে নিতে হয় যে, লোকটি আপনাকে ব্ল্যাকমেল করার জন্যই এই কাণ্ড করেছে। আমি তাই জানতে চাইছি, তেমন কোনও ঘটনা ঘটেছে কি? আর ইউ বিয়িং ব্ল্যাকমেলড?

তাহলেই বা আপনি কী করবেন?

আপনি উত্তেজিত হয়ে আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন লোকটাকে খুন করার। মনে আছে?

মনে আছে।

আপনি ভাড়াটে খুনিকেও হায়ার করতে চেয়েছিলেন।

হ্যাঁ। এখনও চাই।

প্লিজ়! মাথা ঠান্ডা করুন। বুধাদিত্যর টাকার অভাব নেই। ওঁদের চারটে জুয়েলারি শপ আছে। উনি টাকার জন্য ব্ল্যাকমেলের রাস্তা নেবেন, এটা বিশ্বাস করা শক্ত। উনি কীভাবে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছেন?

শুধু টাকার জন্যই লোকে ব্ল্যাকমেল করে, তা তো নয়।

আমি সেটাই জানতে চাইছিলাম ম্যাডাম। উনি আপনাকে কীভাবে ব্ল্যাকমেল করছেন? আর ইউ বিয়িং সিডিউসড বাই হিম?

হ্যাঁ। বুধাদিত্য আমার কতটা ক্ষতি করেছে তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না।

সরি ম্যাডাম। সিচুয়েশনটা বুঝতে আমার একটু সময় লেগেছে। এখন আপনাকে আমি হেল্প করতে চাই।

কীভাবে?

খুনখারাপির আইডিয়া ছেড়ে দিন ম্যাডাম। তবে লোকটাকে ইম্মোবাইল করার ব্যবস্থা হতে পারে।

সেটা কীরকম ভাবে?

এমন একটা ব্যবস্থা করা যাতে সে আপনাকে আর ডিস্টার্ব করবে না।

বুঝিয়ে বলুন।

পদ্ধতিটা খুব মোলায়েম নয় ম্যাডাম। পেশাদার গুন্ডার হাতে মার খেলে যে-কেউ ঠান্ডা হয়ে যায়। সঙ্গে লাইফ থ্রেট থাকলে তো কথাই নেই।

আপনি হঠাৎ আমার এই উপকারটা করতে চাইছেন কেন?

কারণ, আমার মনে হল, আপনি হয়তো মরিয়া হয়ে সত্যিই কোনও সুপারি কিলারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবেন। সেটা খুবই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে আপনি গভীর গাড্ডায় পড়ে যেতে পারেন।

নন্দিনী একটু ভাবল। তারপর বলল, ঠিক আছে। আমি রাজি।

মনে রাখবেন ম্যাডাম, নো কিলিং। আমি আপনাকে একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিচ্ছি। লোকটার নাম বাবু। তাকে আমার বলা আছে। আপনি মনস্থির করলে ওকে ফোন করতে পারেন।

নম্বরটা দিন।

সিটি সেন্টারে বাবুকে কাছে থেকে দেখে তার মনে হয়েছিল

লোকটা যেন বড্ড সাদামাটা। গুন্ডা বলে মনে হয় না। তবে চোখের মধ্যে একটা কিছু আছে। সেটা অস্বস্তিকর। নিরিবিলি একটা রেস্তরাঁয় বসেছিল তারা। কফি নেওয়ার পর নন্দিনী কাপে চুমুক দিয়ে খুব চাপা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, খুন করতে আপনি কত নেন?

লোকটা একটু যেন অবাক হয়ে বলল, ভট্‌চায তো আমাকে অন্যরকম বলে রেখেছে।

আপনার ক্লায়েন্ট তো আমি, ভট্‌চায নয়।

লোকটা একটু অন্যমনস্ক হয়ে কফিতে কয়েকবার চুমুক দিল। তারপর বলল, পাঁচ লাখ।

ডান।

অ্যাডভান্স তিন লাখ। বাকি পেমেন্ট কাজ হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।

আমি দুই এনেছি। ভাববেন না, বাকিটা ঠিক পেয়ে যাবেন।

কিন্তু সময় দিতে হবে। টার্গেটকে ফলো করে তার মুভমেন্ট জানতে হয়, অপারেশনের স্পট ঠিক করতে হয়।

তাহলেও কত দিন?

খুব বেশি হলে দুই সপ্তাহ।

ঠিক আছে।

সেদিন বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল নন্দিনীর। জীবন যে শেষ হয়ে গেছে, এটা নন্দিনী টের পায়। খুব টের পায়। কিন্তু নিজে মরবার আগে বুধাদিত্যর মৃত্যু নিশ্চিত না করলে বৃথা মরে গিয়ে লাভ কী? পরলোক আছে কি না সে জানে না। যদি থেকে থাকে তবে বুধাদিত্যর সঙ্গে বরং সেইখানেই তার আবার দেখা হবে।

গয়না খুলে ভারমুক্ত হয়ে সে বাথরুমে গিয়ে মুখের মেক-আপ তুলে ফেলল। যেন এতক্ষণ থিয়েটারের অভিনয় করে আসতে হল তাকে।

ঘরে এসে এসিটা বাড়িয়ে দিতে গিয়ে সে দেখল, দরজায় গোপাল

দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ে গরদের পাঞ্জাবি, পরনে বাহারি গরদের ধুতি, গোপালকে খারাপ দেখাচ্ছে না। দেখতে গোপাল মোটামুটি সুদর্শন। তবে সামান্য একটু মেদের সঞ্চার আছে শরীরে। ইদানিং মেদ ঝরানোর জন্য সকালে কেড্‌স পরে দৌড়য়, খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে।

নন্দিনী বলল, কিছু বলবে?

একটা কথা।

বলো।

আজকের অনুষ্ঠানে আমি কিন্তু বুধাদিত্যকে নেমন্তন্ন করেছিলাম।

স্বাভাবিক। তোমার বন্ধুকে তুমি নেমন্তন্ন করতেই পারো।

সে আসেনি।

তাও জানি তো!

বুধাদিত্য আমার খুব ভাল বন্ধু, নন্দিনী।

সেটাও জানি। তোমাদের বন্ধুত্ব আমিই নষ্ট করে দিয়েছি।

না, নন্দিনী। বুধাদিত্য এখনও আমার বন্ধু।

তুমি হয়তো একজন মহাপুরুষ। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার বন্ধুর অ্যাফেয়ার জেনেও তুমি তোমার স্ত্রীকে শাসন করোনি, বন্ধুর সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রেখেছ। কনগ্র্যাচুলেশনস। কিন্তু তুমি মহামানব হলেও আমি মহামানবী নই। আমি দোষে-ঘাটে একজন মেয়েমানুষ। আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না।

মহাপুরুষ নই, তবে প্র্যাকটিক্যাল। ভেঙে ফেলা যত সহজ, নির্মাণ তো তত সহজ নয়। বুধাদিত্যর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব শুরু হয়েছিল ক্লাস ফাইভ থেকে। খুব আস্তে আস্তে একটা বন্ড তৈরি হয়েছে। তোমার সঙ্গে সাত বছরের সম্পর্ক। আমার কাছে সম্পর্ক জিনিসটা খুব মূল্যবান। সম্পর্ক মানে একটা অর্জন। আমাদের মূল্যবান ক্যাপিটাল, বিনাশকে আমি বড় ভয় পাই।

তুমি কি আমাকে বিশেষ কিছু বলতে এসেছ?

হ্যাঁ। বুধাদিত্য সম্পর্কে।

বুধাদিত্য সম্পর্কে কিছুই জানবার আগ্রহ আমার নেই।

বুধাদিত্য ভাল নেই, নন্দিনী।

কে ভাল আছে বা নেই তা জেনে আমি কী করব?

আজ বুধো রাত আটটা নাগাদ ওদের শ্যামবাজারের শোরুম থেকে বাইপাস ধরে বাড়ি ফিরছিল, সরিতাকে তুলে নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে আসবে বলে। সেই সময়ে ওর গাড়িতে কেউ গুলি চালায়।

শুনেই বুকটা ধক করে উঠল নন্দিনীর। ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল মুখচোখ। মাথাটা নত করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

বুধো গাড়ি চালাচ্ছিল। ডানদিকের জানালার কাচ ভেঙে গুলিটা ওর মাথা ঘেঁষে চলে যায়। গায়ে লাগেনি, তবে কাচের টুকরোয় ইনজুরি হয়েছে। গুলিটা কে চালিয়েছে বা কেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। ওর আশেপাশে সামনে-পেছনে অনেক গাড়ি আর মোটরবাইক ছিল। পুলিশ এনকোয়ারি করছে।

ফেসক্রিমের টিউবটা হাতে নিয়ে নন্দিনী একটু ক্লান্ত গলায় বলল, ঘটনাটা দুঃখের।

বুধোকে কে মারতে চাইবে তা আমি আকাশ-পাতাল ভেবেও আন্দাজ করতে পারছি না। বুধোও ভেবে পাচ্ছে না। ওর কোনও শত্রু নেই। প্রফেশনাল রাইভ্যালরি নেই, কারও ভেস্টেড ইন্টারেস্টে হাত দেয়নি। নিরীহ, নির্বিরোধী একজন ভদ্রলোক। তাকে কে মারতে চাইবে?

অত ভাবছ কেন? পুলিশ তো এনকোয়ারি করছেই।

আমার মনটা বড্ড অস্থির, নন্দিনী। খবরটা পাওয়ার পর থেকে আমার ভেতরে একটা টালমাটাল চলছে। বুধোকে কে মারতে চায়? কেন মারবে?

নন্দিনী আড়চোখে চেয়ে দেখল, গোপালের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। উত্তেজনায় মুখটা লাল। চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি।

এখনও পোশাক ছাড়োনি, তুমি কি ওঁকে দেখতে যাচ্ছ?

না। সরিতা বলল এখন ঘুমোচ্ছে। তোমার কাছে সিডেটিড আছে?

আছে। দেব?

দাও তো একটা। টেনশনে আজ আমার ঘুম আসবে না।

ভরা পেটে সিডেটিড তেমন কাজ করে না। দুটো খেয়ো।

এই বলে একটা সিডেটিডের স্ট্রিপ ড্রয়ার থেকে বের করে গোপালকে দিল নন্দিনী। সিডেটিডের স্টক তার ভালই। না খেলে আজকাল সে ঘুমোতেই পারে না।

গোপাল তার ঘরে চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে নন্দিনী দাঁতে দাঁত পিষল। লোকটা গুড ফর নাথিং। সব ভন্ডুল করে দিল। ফোনটা তুলে বাবুর নম্বর ডায়াল করল সে। সুইচড অফ। তিন-চারবার তবু চেষ্টা করল। সুইচড অফ।

ঘর অন্ধকার করে শুয়ে অন্ধকার সিলিংয়ের দিকে ভ্রমহীন চোখে চেয়ে রইল নন্দিনী। নিজে সে কীভাবে মরবে তা তার ঠিক করাই আছে। এই বাড়ির ছাদ আটতলা। পিছন দিকে একটা বাঁধানো চাতাল আছে। লাফ দেওয়ার সময় শাড়ি পরবে না সে। শাড়ি উড়ে বে-আব্রু হওয়ার ভয় থাকে। একটা চুড়িদার পরবে। মুখটা ওড়নায় ঢেকে নেবে। নীচে পড়তে দু'-তিন সেকেন্ডের বেশি লাগবে না। তারপর শরীর তো একটা ভাঙা ডলপুতুল মাত্র। কিন্তু তার আগে বুধাদিত্যকে মরতে হবে। নিশ্চিত খবরটা পেলে আর দেরি করবে না নন্দিনী। ছাদে উঠে যাবে। মাধ্যাকর্ষণ তো তার জন্য কোল পেতেই আছে।

বড় ধীরে ধীরে রাতটা কাটছিল। যখন আকাশ একটু একটু ফরসা হতে শুরু করেছে তখন ঘুমিয়ে পড়ল নন্দিনী। কত যে আজেবাজে স্বপ্ন দেখল তার মাথামুন্ডু নেই। তাদের ডাইনিং টেবিলে বসে একটা কাক আধখানা বিস্কুট ঠুকরে খাচ্ছে। ভয় পেয়ে নন্দিনী 'হুশ হুশ' করছে। কিন্তু কাকটা উড়ে যাচ্ছে না। যাবেই বা কী করে? এসি চলছে,

ঘরে জানালা-দরজা বন্ধ। নন্দিনীর ভয় হল, তবে কি কাকটা এখানেই থেকে যাবে? বাসা করবে? ডিম পাড়বে? আবার দেখল, সেই কবেকার তার ছেলেবেলার জর্দাপিসি একটা নর্দমা পেরোতে গিয়ে থতমত খাচ্ছে। মস্ত নর্দমা, তাতে পাকা কাঁঠালের ভুতি, মরা ইঁদুর, পচা জল। জর্দাপিসি পেরোবে কী করে? সে চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়াও পিসি, আমি আসছি। জর্দাপিসি বলল, দ্যাখ তো, নর্দমার ওপাশেই তো আমার ঘরখানা ছিল! এখন তো ঘর দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় গেল বল তো! তাদের মুহুরিবাবুকেও দেখতে পেল নন্দিনী, গায়ে টিকিট চেকারের কালো কোট আর সাদা প্যান্ট, তার দিকে চেয়ে মুহুরিবাবু বললেন, না না ম্যাডাম, আমি স্টেশনমাস্টার নই। সেই যখন হাফপ্যান্ট পরতুম সেই বয়স থেকেই আমি পোস্টমাস্টার।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল তার। গোপাল বেরিয়ে গেছে। বাড়ি নিঝুম। ঘুমের জড়তা কাটতেই সে মোবাইল তুলে বাবুর নম্বর ডায়াল করল। সুইচড অফ। সারাটা সকাল পনেরো মিনিট বা আধঘণ্টা পর পর ফোন করে গেল সে। বাবুর ফোন সুইচড অফ।

অত্যাশ্চর্য টেলিফোনটা এল দুপুরবেলায়। স্ক্রিনে নম্বরটা দেখে প্রথমটায় বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। বুধাদিত্য! এতদিন পর? মাথাটা ঝাঁ করে উঠল তার। রাগে কঠিন হয়ে যাচ্ছে হাত-পা।

ফোনটা অন করে সে শুধু বলল, হুঁ।

একটা ক্লান্ত গলা শোনা গেল, নন্দিনী! আমি বুধাদিত্য।

হুঁ।

চিনতে পারছ তো!

নন্দিনী চুপ।

কিছু বলবে না নন্দিনী?

ফোনটা তো আমি করিনি! আমার কিছু বলারও নেই।

নন্দিনী, প্লিজ় ফোনটা ছেড়ে দিয়ো না। একটু শোনো।

শুনছি।

তুমি বোধহয় জানো, কাল রাতে আমাকে কেউ গুলি করেছিল। গুলিটা গায়ে লাগেনি। শুনতে পাচ্ছো তো?

হুঁ।

ডান দিক থেকে কেউ গুলি চালায়। তবে সে কে আমি জানি না। আমাকে মেরে তার কী লাভ তাও আমি ভেবে পাচ্ছি না। চলন্ত গাড়িতে গুলি চালিয়ে যারা মানুষ মারে, তারা অবশ্যই প্রফেশনাল। সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছি সে আবার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয়বার হয়তো ফসকাবে না।

এসব জেনে আমার কী হবে? আপনি পুলিশ প্রোটেকশন নিন।

পুলিশ প্রোটেকশন? সেটা কেন নিতে যাব?

আপনার কথা কি শেষ হয়েছে? ছাড়ছি!

প্লিজ় নন্দিনী! আর একটু সময় দাও। খুব বেশিক্ষণ নয়। কিন্তু কথাগুলো আমার বলা খুব দরকার।

হুঁ।

এত চুপ করে থাকছ যে, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ফোন বোধহয় ছেড়ে দিয়েছ। মাঝে মাঝে একটু হুঁ দিয়ো, তাহলেই হবে প্লিজ়।

হুঁ।

সব মানুষের মতোই আমারও মৃত্যুভয় আছে নন্দিনী। তবে আমি মাউন্টেনিয়ার বলে ভয়টা অ্যাভারেজের চেয়ে কম। কেউ আমাকে খুন করতে চাইছে বলে আমি তো আর ঘরে বসে থাকতে পারি না। বা পালিয়েও যেতে পারি না। কালকের ঘটনার পর আমি বুঝতে পেরে গেছি যে, কারও কাছে আমার মৃত্যুটা খুব জরুরি।

এবার ছাড়ছি। আমার ভাল লাগছে না।

আর একটু নন্দিনী। পাঁচ-সাত মিনিট মাত্র। আমার একটা ভিক্ষা আছে।

হুঁ।

এবার যখন পাহাড়ে গিয়েছিলাম তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল।

ঘটনাটা একটু অদ্ভুত। আমরা দু'জন সামিটে উঠবার চেষ্টা করছিলাম। আমার প্রায় বারো-চোদ্দো ফুট ওপরে একজন, পিছনে আমি। সামিটের কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেছি, তখন আমার বাঁ ধারের ঢালে বরফের মধ্যে প্রায় ঢাকা পড়ে যাওয়া একটা ডেডবডি দেখতে পেলাম। তার মাথা নীচের দিকে। পা ওপরে। পাহাড়ে এরকম মৃতদেহ পড়ে থাকতে মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু হঠাৎ আমি চমকে উঠে দেখলাম বরফে ঢাকা লোকটা হঠাৎ তার বাঁ হাতটা তুলে আমাকে চিৎকার করে বলল, হেঃ, গিভ মি এ ফ্যাগ। কিছুক্ষণ হাতটা শূন্যে উঠে রইল, তারপর ধপাস করে পড়ে গেল। ভেবেছিলাম লোকটা বোধহয় বেঁচে আছে। তখন আমাদের থামবার উপায় ছিল না। সঙ্গীকে ইশারা করে থামতে বললাম, ও আমাকে থামতে বারণ করল। শুনছ তো নন্দিনী?

হুঁ।

শেষ পর্যন্ত সামিটের খুব কাছাকাছি উঠেও ওয়েদার খারাপ হওয়ায় আমাদের নেমে আসতে হয়। নামবার সময় আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য লোকটার কাছে থেমেছিলাম। লোকটা বেঁচে ছিল না, অনেকদিন আগেই মারা গেছে। তার নাম জন লেসন। গুগল সার্চ করে জেনেছি কনফার্মড ডেথ। নন্দিনী, তুমি বিরক্ত হচ্ছ না তো! আমার কথা ফুরিয়ে এসেছে নন্দিনী। আর একটুখানি সময় দাও।

হুঁ।

পাহাড়ে ওঠার সময়ে আমাদের ইয়ার প্লাগ থাকে, বাইরের শব্দ শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তবু আমি লোকটার চিৎকার স্পষ্ট শুনেছি, হেঃ, গিভ মি এ ফ্যাগ। লোকটা বহুদিন আগে মারা গেছে। সুতরাং হাত তুলে ইশারা করা সম্ভব নয়। আর ওই হাই-অলটিচ্যুডে পাগল ছাড়া কে সিগারেট খেতে চাইবে বলো! কিন্তু আমি ভুল শুনিওনি, ভুল দেখিওনি। সেই থেকে ওই বাক্যটা আর ওই হাত তুলে থাকার দৃশ্য ভূতের মতো আমাকে তাড়া করছে। বারবার মনে হচ্ছে পাহাড়ে

বরফের ঢালে হেঁটমুন্ডু হয়ে একটা লোক একটা সিগারেটের জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করে আছে আমার পথ চেয়ে। আমাকে একবার তার কাছে ফিরে যেতেই হবে। একটা সিগারেট জ্বেলে তার দু'আঙুলের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে এলে তবে আমার মুক্তি। আমি প্রতি রাতে ঘুমের মধ্যে লোকটার ডাক শুনতে পেয়ে চমকে জেগে উঠি। সারাদিন নানা কাজের মধ্যে হঠাৎ পাহাড়ের ঢালে পড়ে থাকা মানুষটার ওপরে তোলা হাতখানা দেখতে পাই। শুনছ তো নন্দিনী?

হুঁ।

নন্দিনী, মরে যাওয়ার আগে একবার সেই লোকটার কাছে যে আমাকে যেতেই হবে। আমার কেবলই মনে হয়, এইটাই আমার শেষ কাজ। তাই আমি একটু সময় চাই নন্দিনী। মাত্র পনেরো দিন। তার বেশি নয়। তারপর কারও বন্দুকের চাঁদমারি হয়ে যেতে আমার আপত্তি নেই। এই সময়টুকু কি আমাকে ভিক্ষে দেওয়া যায় নন্দিনী?

আমি? আমার কাছে চাইছ কেন?

কে জানে, হয়তো ভুল লোকের কাছে ভুল কিছু চেয়ে ফেললাম। কিন্তু কার কাছে চাইতে হবে তা তো জানি না। তাই তোমার কাছেই চাইলাম। এখন তোমার ইচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনল নন্দিনী। তারপর ফোনটা কেটে গেল।

নন্দিনী চোখের টলটলে জল মুছল। তারপর বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিল মুখে। তারপর ঘরে এসে স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর বাবুকে ফোন করল। সুইচড অফ। আশ্চর্য! লোকটা ফোন বন্ধ রেখেছে কেন?

অগত্যা বৈদূর্যকে ফোন করল নন্দিনী।

হ্যাঁ ম্যাডাম, বলুন। আপনার কাজ কি হয়ে গেছে?

না বৈদূর্যবাবু, আমি আর ওটা চাইছি না।

চাইছেন না ম্যাডাম?

না। আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা মিটে গেছে।

ভেরি গুড ম্যাডাম। মেলোড্রামা কে চায় বলুন!

কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে যে!

কী মুশকিল ম্যাডাম?

বাবু দাসের ফোন কাল থেকে বন্ধ। অথচ ওকে খবরটা দেওয়া জরুরি। ওকে ইমিডিয়েটলি বলা দরকার যে, কোনও অ্যাকশন নয়।

কিন্তু ম্যাডাম, মোবাইল বন্ধ থাকলে খবর দেওয়া যাবে কীভাবে? ওরা আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোক। অনেক সময়ে মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন ট্রেস এড়াতে মোবাইল অফ করে দেয়। ওদের গতিবিধি বোঝা মুশকিল।

প্লিজ়! আপনি কিছু করুন। আমি ভীষণ টেনশনে আছি।

দেখছি ম্যাডাম। অন্য কারও মাধ্যমে যদি খবর পাঠানো যায়। তবে গা-ঢাকা দিয়ে থাকলে মুশকিল।

প্লিজ়! প্লিজ়! কিছু একটা করুন।

আরও দুটো অসহ্য দিন কাটবার পর বৈদূর্যর ফোন এল।

ম্যাডাম, বাবু বাংলাদেশে গেছে।

বাংলাদেশে? কেন?

তা কে বলবে ম্যাডাম! মানুষের কত রকম ধান্ধা থাকে। হয়তো কোনও মার্ডার করে পালিয়ে গেছে।

খবরটা কি দিতে পেরেছেন ওকে?

না। দু'-চার দিনের মধ্যেই ফিরবে বলে শুনছি।

আমি খুব টেনশনে আছি কিন্তু।

টেনশন কীসের? রোজ দু'বেলা ওর মোবাইলে ট্রাই করে যান। ফিরেই মোবাইল চালু করবে। আমিও খেয়াল রাখব।

থ্যাংক ইউ।

কিন্তু নন্দিনী একটা তীব্র উৎকণ্ঠ অস্থিরতায় কাঁটা হয়ে রইল। মন ভাল নেই। তার মন ভাল নেই। গোপাল মামলার ব্যাপারে এলাহাবাদ

গেছে। কেন যে একা তাকে ফেলে রেখে যায়! এবার গোপালকে সে বলবে, তাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে।

রোববার সকালে ডোরবেল বাজল। দরজা খুলে নন্দিনী অবাক হয়ে বলল, ওমা? আয়ুষ্মান! এসো, ভেতরে এসো।

আয়ুষ্মান চোখ নত করে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে রইল।

দাঁড়িয়ে কেন, বোসো। কিছু বলবে?

হ্যাঁ ম্যাডাম। একটা জরুরি কথা ছিল।

জরুরি কথা? কী কথা বলো তো?

ওই বাবু নামে যে-লোকটা সেদিন গাড়িতে উঠেছিল, সেই লোকটা কিন্তু খুব খারাপ। সুপারি কিলার।

তাই বুঝি?

ম্যাডাম, আমার হয়তো বলা উচিত হচ্ছে না, কিন্তু আপনি একটু সাবধান হবেন।

তুমি কি বাবুকে চেনো?

চিনি ম্যাডাম।

কীরকম চেনো? ওর ঠিকানা জানা আছে তোমার?

কোনও প্রবলেম হবে না ম্যাডাম। পাঁচ মিনিটে বের করে ফেলব।

তাহলে আমার একটা উপকার করতে পারবে ভাই?

বলুন ম্যাডাম। আপনার জন্য আমি সব করতে পারি।

নন্দিনী একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আয়ুষ্মানের ঘাড় নোয়ানো, পায়ের দিকে চোখ। একবারও তার চোখে চোখ রাখেনি। ছ'ফুট লম্বা, পেটানো চেহারার ছেলেটা কেমন জড়োসড়ো হয়ে বেচারার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

নন্দিনী মুচকি একটু হেসে বলল, আমার জন্য সব করতে পারো? কেন বলো তো! আমি এমন কে!

পারি ম্যাডাম।

যদি কোনও বিপদের কাজ হয়?

পারব ম্যাডাম। আপনার জন্য প্রাণ দিতে পারি।

নন্দিনীর ভারী মায়া হল। বলল, আয়ুষ্মান, তুমি কি আমার প্রেমে পড়েছ?

বললাম তো ম্যাডাম, আপনার জন্য সব করতে পারি।

তুমি যদি আমাকে ভালবেসেই ফেলে থাকো তা হলে লজ্জা পেয়ো না। ভালবাসা কোনও অপরাধ নয়। একটা মেয়েকে একটা ছেলে তো ভালবাসতেই পারে।

আপনি বলুন না ম্যাডাম, কী করতে হবে।

কিন্তু একটু যে মুশকিল হয়ে গেল ভাই।

কী মুশকিল?

আমাকে যে ভালবাসে তাকে আমি যে এই কাজে পাঠাতে পারব না। কারণ এই কাজটাতে একটু রিস্ক আছে! ভালবাসার মানুষকে কি বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে হয়?

কীসের বিপদ ম্যাডাম? ছেলেবেলা থেকে আমি বোমা, বন্দুক, পিস্তলের মধ্যে বড় হয়েছি। গুন্ডা বদমাশদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের থাকতে হয়। আপনি ভাববেন না ম্যাডাম। আমার কিছু হবে না।

বুঝেছি, তুমি খুব বীরপুরুষ। তাই না? কিন্তু আমার বীরপুরুষ এখন তোমার কিছু হলে যে আমি ভীষণ দুঃখ পাব।

কিছু হবে না ম্যাডাম।

তাহলে বাবু দাসকে আমার একটা চিরকুট পৌঁছে দিয়ো। মুখেও বোলো। নন্দিনী সেন বলেছে, কাজটা আর ওকে করতে হবে না। ঠিক ওর হাতেই চিরকুটটা পৌঁছনো দরকার।

নো প্রবলেম ম্যাডাম। আসি।

এসো।

আয়ুষ্মান চলে গেলে দরজাটা বন্ধ করে নন্দিনী একটা শ্বাস ছেড়ে আপনমনে বলে উঠল, বেচারা!

বিকেলের ফ্লাইটে ফিরে এল গোপাল। জামাকাপড় বদলাল, স্নান করে পরিচ্ছন্ন হল।

আজ কাজের মেয়েটা আসেনি। নন্দিনী কফি করে নিয়ে এল লিভিং রুমে।

তুমি কি আজ আর বেরোবে?

ইচ্ছে নেই। টায়ার্ড লাগছে। সন্ধের পর একটা ডিনারে যাওয়ার কথা। ককটেল ডিনার।

স্কিপ করা যায় না?

কেন বলো তো!

সেই কবে গাড়ি চালাতে শিখেছিলাম। বহুদিন প্র্যাকটিস নেই। আজ একটু ড্রাইভ করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু একা ঠিক সাহস হয় না। তুমি সঙ্গে থাকবে?

আমি? ঠিক আছে। আগে বলো তোমার কনফিডেন্স লেভেল কেমন?

সেটারও পরীক্ষা দরকার।

ঠিক আছে। চলো। না পারলে তো আমি আছিই।

স্টিয়ারিংয়ে বসবার পর একটু নার্ভাস লাগছিল নন্দিনীর। কিন্তু আস্তে আস্তে খানিকটা চালিয়েই সে বুঝতে পারল, কিছুই ভোলেনি।

গোপাল পাশে বসে খুব মন দিয়ে দেখছিল তার গাড়ি চালানো। বাইপাস হয়ে অনেকটা দক্ষিণ অবধি চলে গেল নন্দিনী। মুখে একটু হাসি। নিজেকে আজ অনেক ভারমুক্ত লাগছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর তারা ফিরে এল।

কেমন চালাই বলো!

গ্রেট।

একটা প্রাইজ় দেবে?

কী চাও?

একটা ছেলে বা মেয়ে।

সাত

ইস! এইভাবে মেরেছে তোকে! ঠোঁট ফেটে গেছে, কপালে কত বড় কালশিটে, হাতে ব্যান্ডেজ, চোখ ফোলা! তুই কিছু করলি না?

কী করব বউদি? এ তো তবু ভাল। ড্যাগার বের করেছিল মেরে ফেলবে বলে। বরুণ জাপটে ধরায় আমি পালিয়ে যেতে পারি।

পুলিশে যাসনি?

গিয়ে? ওরা কিছু করবে নাকি? আর যদি ধরে নিয়ে যায় তাহলে ছাড়া পেয়ে আরও খার নিয়ে হামলা করবে।

একটা সত্যি কথা বল তো! ও কি তোকে খুব ভালবাসত?

ভালবাসা আবার কীসের! ওর কথা হল, তুই আমার মেয়েমানুষ, আমার কুকুর, কেবল আমারই পা চাটবি আর আমার শেকলে বাঁধা থাকবি।

শত হলেও তোর বর তো।

হ্যাঁ বর। বর মানে কী জানো তো? তোমাদের মতো তো নয়। আমাদের সব অন্যরকম। রোজগারের টাকা নিয়ে নেবে, পেটাবে, হুকুম করবে। ওসব তুমি ঠিক বুঝবে না।

কিন্তু এরকম হতে থাকলে তো মুশকিল। আমার তো ভয় হয় তোকে সত্যিই না খুন-টুন করে বসে।

সেই তক্কে-তক্কেই তো আছে। টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বস্তিতে। আমাকে নাকি ফিরিয়ে নেবে। যাইনি বলেই তো রাগ।

ইস! বড্ড মেরেছে তোকে! বড্ড পাজি ছেলে তো!

বরুণকে আরও মেরেছে। মাথা ফেটেছে, হাতে পায়ে ড্যাগার চালিয়ে কতটা ক্ষত করেছে জানো না।

বরুণটা কে রে?

কুরিয়ার সার্ভিসের ডেলিভারি ম্যান। ভাল ছেলে বউদি। ওর সঙ্গেই তো হোম ডেলিভারির ব্যাবসা করব বলে ঠিক করেছি। আর কিছু টাকা জমলেই ঘর ভাড়া নেব।

কিন্তু মানিক কি তোকে শান্তিতে থাকতে দেবে?

সুমিতা এবার হাসল। বলল, ভেবো না বউদি। জীবনে কখনও শান্তিতে থেকেছি নাকি? এইটুকু বেলা থেকে লোকের বাড়িতে কাজ করে বড় হয়েছি। একটা প্লেট বা কাপ ভাঙলে চুলের মুঠি ধরে মারত। বাবাও কি ভাল ছিল? মুড়ি-তেলেভাজা আনতে গিয়ে দেরি হয়েছিল বলে লাথি মেরে নর্দমায় ফেলে দেয়। পড়াশুনো করতে ইচ্ছে হত, কিন্তু বই নিয়ে বসবার সময়ই তো হত না। ঝঞ্ঝাটে আমাদের অভ্যেস আছে।

তুই কি বরুণকে বিয়ে করবি?

জানি না বউদি। আমাদের আবার বিয়ে। আগে তো থিতু হই। তারপর ভাবব।

বেশ আছিস তোরা।

সুমিতা হাসল, আছি বউদি। আমরাও আছি।

রজতশুভ্রর ঘরে চুপ করে বসে ছিল সুমিত। কত পুরনো কথা মনে পড়ছে। খুব ছোট্ট তখন বাবা সাইকেলের রডে চাপিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিত। বাবাই সাঁতার কাটতে শেখাল, সাইকেল চালাতে শেখাল। একদিন দেখল, সে বাবার চেয়ে একটু লম্বা হয়ে গেছে। বাবা একগাল হেসে কী গর্বের সঙ্গে বলেছিল, তুই বড় হয়ে গেছিস।

কয়েকদিন আগে সে চুরি করে মিমির মোবাইলটা নিয়ে কললিস্ট দেখছিল। দাদুর নামে কোনও এন্ট্রি ছিল না। রজতশুভ্র নামেও না। কিন্তু আর অক্ষরের ঘরে একটা এন্ট্রি ছিল রিজেক্ট। আশ্চর্য ব্যাপার। রিজেক্ট মানে কী?

নম্বরটা ডায়াল করে কান পেতে রইল সুমিত।

তারপর অনেকদিন বাদে বাবার চেনা গলাটা শুনতে পেল সে, কী রে দিদিভাই?

ফোনটা কেটে কল-রেকর্ড ডিলিট করে দিয়েছিল সুমিত। বুকে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা। বাবার সঙ্গে তার কি একটু কথা বলা উচিত ছিল? না। সেটা ঠিক হত না।

কিন্তু সে ভেবে পেল না বাবার নম্বরটা রিজেক্ট নামে সেভ করা আছে কেন? মিমি কি ধরেই নিয়েছে তার দাদুকে এই পরিবার রিজেক্ট করে দিয়েছে? ওই রিজেক্ট কথাটার মধ্যে যেন মিমির তীব্র অভিমান লুকিয়ে রয়েছে। সে যেন চিৎকার করে বলতে চাইছে, তোমরা আমার দাদুকে বাতিল করে দিয়েছ?

একদিন সে মিমির ঘরে সন্ধের পর সন্তর্পণে ঢুকে বসল।

কী বাবাই?

দাদুর কথা খুব মনে পড়ে তোর, না?

পড়ে তো।

দাদুকে দেখতে ইচ্ছে করে?

তা তো করেই। কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছ?

এমনি।

তোমার কি দাদুর জন্য মন কেমন করছে?

হ্যাঁ রে। করছে।

আমারও করে।

যাবি মিমি?

কোথায় যাব?

দাদুর কাছে!

মিমি অবাক হয়ে বলে, দাদুর কাছে! দাদুর কাছে কী করে যাব? দাদু তো হারিয়ে গেছে।

সুমিত মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, আমার সঙ্গে তুমি

কি একটু লুকোচুরি খেলছ মা?

কেন বাবাই, কী করেছি?

তুমি তো জানো দাদু কোথায় আছে। জানো না?

মিমি চোখটা সরিয়ে নিল। তারপর বলল, তোমাকে গোয়েন্দাকাকু কিছু বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ। তুই যদি বলে দিতিস তাহলে এত হাঙ্গামা করতে হত না। কেন বললি না আমাকে? কত টেনশন গেল আমার, দেখিসনি?

দাদুর সঙ্গে আমার একটা প্যাক্ট হয়েছিল যে!

কীসের প্যাক্ট?

দাদুর হোয়ার অ্যাবাউটস্ শুধু আমি জানব। আর কেউ না।

আমি একটা ভুল করেছিলাম বলে বাবা যে আমার ওপর এত রাগ করবে, তা তো কখনও ভাবিনি। বাবা কি জানে না আমি তাকে কত ভালবাসি?

বাবাই, তোমার ওপর দাদু রাগ করেনি তো! দাদু আমাকে প্রায়ই বলত, তার এখানে ভাল লাগে না। দাদু মানুষজন ভালবাসে, গাছপালা ভালবাসে, খেত-খামার ভালবাসে। দাদুর সময় কাটতে চাইত না। দাদু বলে, বেঁচে থাকা আর জীবনযাপন এক নয়। এখানে আমি শুধু বেঁচে আছি!

একবার যাবি দাদুর কাছে মিমি? তাহলে প্রোগ্রাম করে ফেলি।

না বাবাই। দাদুকে ছাড়া আমার একটুও ভাল লাগে না। তবু দাদুর কাছে যেতে চাই না।

কেন রে?

আমাকে দেখলে দাদুর ফের কষ্ট হবে। দাদুকে দেখলে আমারও হবে। দাদু ভাল আছে বাবাই। দাদু এখন খেত-খামারে ঘুরে বেড়ায়, সাইকেলে করে বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলতে যায়, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়। এখানে দাদু শুধু সারাদিন চুপ করে বসে থাকত, খবরের কাগজ পড়ত, টিভি দেখত আর ঘুমিয়ে থাকত। তাই না বলো!

সুমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তুই বোধহয় ঠিকই বলছিস।

আজ বাবার বিছানাটায় আদর করে একটু হাত বোলাল সুমিত। মাঝে মাঝে কত মনে পড়ে, বড্ড বেশি মনে পড়ে।

দাদা!

ঘোর অন্যমনস্ক চোখ তুলে সুমিত দেখল, দরজায় সুমিতা দাঁড়িয়ে। লকলকে শরীরে আঁট করে পরা একখানা হলুদ শাড়ি। কপালে হলুদ টিপ, মুখে একটু রহস্যময় হাসি।

কিছু বলছ?

একটু কফি করে দেব?

'কফি' কথাটা যেন বুঝতে পারল না সুমিত। সে কফি খেতে খুব একটা পছন্দ করে না। কিন্তু সুমিতা ছুটির দিনে প্রায়ই তাকে কফি করে দিতে চায়। কেন, তা সুমিত বুঝতে পারে না।

কফি?

হ্যাঁ। বউদি আর মিমি বেরিয়ে গেছেন। আমি ভাবলাম যদি আপনার কিছু দরকার হয়।

আচমকা সুমিতের মনে পড়ল, কফি খাওয়ার প্রস্তাবটা যেন একটা কীসের ইঙ্গিত। কীসের ইঙ্গিত? মাই গড! এ মেয়েটা কি তাকে সেই ইঙ্গিতই করছে নাকি?

হাঁ করে সুমিত দেখল, ললিত বিভঙ্গে নিজের শরীরকে যতদূর সম্ভব প্রকটিত করে দরজার ফ্রেমে নিজেকে সাজিয়ে রেখেছে মেয়েটি। যেন মধুর আমন্ত্রণ। এসো, চলে এসো পুরুষ। আমি প্রস্তুত—

মাঝে মাঝে মানুষের কাণ্ডজ্ঞানকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ভেতরের প্রলয় সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে উঠে আসে। সুমিত বুঝতেই পারল না, তার ভেতরে এতকালের সঞ্চিত সংস্কার, সযত্নের নির্মাণ ভব্যতা ও শালীনতা কোন দমকা হাওয়ায় উড়ে গেল। সত্য বটে, আদিমতার কাছে পোশাক পরা সভ্যতা সর্বদাই অসহায়, সতত দুর্বল। সুমিত

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। বন্য এক দুর্দম আকর্ষণে সে হাত বাড়াতেই সুমিতা চাপা গলায় বলল, এই ঘরে?

এই ঘরে? সুমিত যেন হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গের পর চারদিকে চেয়ে দেখল। এ তার বাবার ঘর। এ এক মুক্ত পুরুষের ঘর। এ এক আনন্দময় মানুষের ঘর। যিনি তাকে অনেক মূল্যবোধ শিখিয়েছিলেন। এ তার বাবার ঘর।

সুমিত গম্ভীর গলায় বলল, আমি কফি খাব না সুমিতা। তুমি রান্নাঘরে যাও।

সুমিতা হাঁ করে একটু চেয়ে রইল। তারপর ধীর পায়ে চলে গেল।

গাড়ির চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সুমিত। নিজের কাছ থেকেও মানুষকে কতবার যে পালাতে হয়!

আট

কালু শুনে বলল, তুই একা যাবি কেন? চল আমিও যাব। ওর ঠেক আমি চিনি। পুরো একটা দোতলা বাড়ি দখল করে আছে।

তুই ঠিকানাটা দে না, আমি একাই চলে যেতে পারব।

তোকে আজকাল একটু অ্যাগ্রেসিভ দেখাচ্ছে। গরম হয়ে আছিস। বাবু দাসের সঙ্গে গরম দেখালে বিপদ আছে। কন্ট্রোল ইয়ার, কন্ট্রোল।

এটা ঠিকই যে, আয়ুষ্মানের ভেতরে একটা অনির্দিষ্ট রাগ টগবগ করছে। সেই রাগ পারলে বাবু দাসকে ছিঁড়ে খায়। কিন্তু সত্যি কথা হল বাবু দাস এখনও এমন কিছু করেনি যাতে তার ওপর আয়ুষ্মানের এই আক্রোশ জন্মাতে পারে। বাবু দাস শুধু ম্যাডামের সঙ্গে সামান্য একটু মেলামেশা করেছে। তাতেই সে এত ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে কেন? কেন ভেবে নিয়েছে যে, বাবু দাস ম্যাডামকে বিপদে ফেলতে চাইছে?

সে বলল, ঠিক আছে, তুইও চল।

সকালবেলাই সবচেয়ে ভাল সময়। পার্ক সার্কাসের স্টপে নেমে মাত্র মিনিট দুয়েকের রাস্তা। গলির মধ্যে দোতলা একটা বাড়ি। বেশ বড়সড়। বেল দিতেই একটা লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা ছেলে বেরিয়ে এল। চোখে কঠিন দৃষ্টি, পাকানো পেটানো চেহারা, বাঁ হাতে ট্যাটু। ডান হাতে মোবাইল।

কী চাই?

কালু বলল, বাবুদা আছে?

কী দরকার?

বলুন আমরা নন্দিনী সেন ম্যাডামের কাছ থেকে আসছি। জরুরি দরকার।

দরকারটা কী?

ম্যাডাম একটা চিঠি পাঠিয়েছেন।

দেখি চিঠি।

আয়ুষ্মান হঠাৎ কঠিন গলায় বলল, চিঠি অন্য কারও হাতে দেওয়া যাবে না। যার চিঠি তার হাতে দেব।

ছেলেটা তার দিকে জ্বলন্ত চোখে চাইতেই আয়ুষ্মানও চোখে চোখ রেখে দৃষ্টিটা ফেরত দিল। তার কোনও ভয়ডর হল না।

ছোকরা বলল, দাঁড়াও।

তারপর মোবাইলটা কানে তুলে বলল, নন্দিনী সেনের কাছ থেকে এসেছে। জরুরি দরকার।

তারা অপেক্ষা করল। মিনিট দুই পরে লুঙ্গি আর মলমলের পাঞ্জাবি পরা বাবু দাস দেখা দিল। মুখে রাজ্যের বিরক্তি। ভ্রু কুঁচকে তাদের দিকে একটু চেয়ে আয়ুষ্মানকে বলল, তুমি ম্যাডামের ড্রাইভার না?

হ্যাঁ।

কী ব্যাপার?

আয়ুষ্মান চিরকুটটা বের করে হাতে দিল। বাবু ভ্রু কুঁচকে চিরকুটটার দিকে চেয়ে বলল, আমি ম্যাডামের হাতের লেখা চিনি না।

আপনি ফোন করে নিন।

খুব বিরক্তির সঙ্গে ছোকরাটার দিকে হাত বাড়িয়ে 'দে তো মোবাইলটা' বলে ফোন নিয়ে একটু যেন মনে করে করে চাবি টিপল।

ইয়েস ম্যাডাম, আমি বাবু। ... না এটা আমার নম্বর নয়। আমার ফোনটা সিকিউরিটির কারণে বন্ধ আছে। নোটটা আপনি পাঠিয়েছেন? ... ওকে, নো প্রবলেম। ... না ম্যাডাম, আমি তো রুস্তম নই। প্রফেশনাল। খামোখা হামলা করব কেন? ... ঠিক আছে। তবে অ্যাডভান্সের এক লাখ টাকা বাকি আছে। পেমেন্টটা করে দিন। ... ঠিক আছে আমি এগারোটায় পৌঁছে যাব। তবে ম্যাডাম, ভেতরে

ঢুকব না, আপনি নীচে এসে দিয়ে যাবেন। ... থ্যাংক ইউ।

কথা শেষ করে বিরক্ত মুখে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নাড়া দিয়ে তাদের সরে পড়তে বলে ভেতরে ঢুকে গেল বাবু দাস।

ম্যাডামের সঙ্গে কী বিচ্ছিরিভাবে কথা বলছিল লোকটা! আয়ুষ্মানের একবার প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল, লাফিয়ে গিয়ে বাবুকে একটা পাঞ্চ মেরে দেয়।

কালু তার হাত ধরে মৃদু টান দিয়ে নিয়ে এল। বলল, উঁচু দরের অপারেটর, বুঝলি? তোর ম্যাডাম কি ওকে সুপারি দিয়েছিল?

যাঃ। ম্যাডাম সেরকম মানুষ নয়।

তাহলে পেমেন্টের কথা হল কেন?

অন্য কোনও ব্যাপার থাকতে পারে।

আয়ু, তুই চেপে যাচ্ছিস। ঘাপলা না থাকলে বাবু দাসের সঙ্গে কেউ কন্ট্রাক্ট করে না। হান্ড্রেড পারসেন্ট সুপারি কেস।

অসম্ভব। আমি শুনেছি প্রপার্টি ম্যাটার। বাবু ম্যাডামের দাদার বন্ধু। ম্যাডাম নিজে বলেছেন।

তিনদিন বাদে একদিন নন্দিনী ম্যাডাম তাকে ডেকে একটা লাল আর কালো চেকের জমকালো শার্ট দিয়ে বললেন, এটা তোমাকে বেশ মানাবে, না? এক্স এক্স এল সাইজ়। গায়ে দিয়ে দেখো তো!

আয়ুষ্মানের চোখ আজও পায়ের দিকে। ঘাড় নিচু। সলজ্জ গলায় বলল, আমাকে গিফ্‌ট দিচ্ছেন কেন ম্যাডাম?

ভালবাসার লোককে কিছু না কিছু দিতে হয়। নইলে ভালবাসা টেকে না। বুঝলে বীরপুরুষ! তুমি যে-মেয়েটিকে ভালবাসবে, তাকে সবসময়ে কিছু না কিছু দিয়ো। কিছু না পারলে অন্তত একটা ফুল। জামাটা পছন্দ হয়নি তোমার?

খুব। দারুণ জামা।

সাইজ়টা হবে তো?

হবে ম্যাডাম। এটাই আমার সাইজ়।

ছোট হলে বোলো। বদলে আনব।

না ম্যাডাম, এটা ঠিক আছে।

তাহলে এবার এসো।

আবার কোনও দরকার হলে বলবেন ম্যাডাম।

হ্যাঁ বলব। তুমি যে আমার জন্য প্রাণ দিতে পারো, তা আমি ভুলিনি।

মানুষ নাকি উড়তে পারে না? বাজে কথা। উড়তে না পারলে সে কী করে নন্দিনী ম্যাডামের ঘর থেকে এতটা পথ চলে এল! পায়ে হেঁটে এসেছে বলে তো তার মনে হল না! না, পায়ে হেঁটে আসেনি তো সে! এখনও শরীর কী যে হালকা তা মানুষকে বোঝাতে পারবে না সে। আজ সারাদিন সে খুব উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াবে।

জামাটা কে দিল রে?— টুকুসের চোখে সন্দেহের ছায়া।

ওই তো, নন্দিনী ম্যাডাম।

হঠাৎ জামা দিল কেন?

এমনি। সুন্দর না?

জামা তো সুন্দর। কিন্তু আজ তো তোর জন্মদিনও নয়।

সেদিন ওদের গাড়িটা চালিয়েছিলাম তো।

তাতে কী হল? গাড়ি চালালে জামা দিতে হয় নাকি?

কী করব! দিলে তো আর রিফিউজ় করতে পারি না।

তোর মুখটা লাল দেখাচ্ছে।

আয়ুষ্মান প্রমাদ গুনল। টুকুসকে সে বড্ড ভয় পায় আজকাল।

নয়

'আপনার আর কোনও বিপদ ঘটবে না। নিশ্চিন্ত থাকুন। যা ঘটে গেছে তার জন্য দুঃখিত।' কয়েকদিন আগে এই মেসেজটা বুধাদিত্যকে পাঠিয়েছিল নন্দিনী। পাঁচ মিনিট পরে জবাব এসেছিল 'অনেক কৃতজ্ঞতা।'

একদিন রাতে ভালবাসাবাসি শেষ হওয়ার পর গোপাল সসংকোচে বলেছিল, প্রসঙ্গটা তোমার পছন্দ নয় জানি। তবু বলতে চাইছি।

কী গো?

ওই পাগলটা একা একাই নাকি ফের পাহাড়ে যাবে বলে গোঁ ধরেছে। এ তো সুইসাইড।

নন্দিনী কিছু বলেনি। ঘুমের ওষুধ ছাড়াই মধুর ঘুমে ঢলে পড়েছিল সে।

দু'দিন পর গোপাল ফের রাতে খবর দিল, শেষ অবধি পাগলটা গোঁ ছেড়েছে। বুঝলে! পাহাড়ে যাচ্ছে না।

নন্দিনী চুপ করে রইল। সে কি ব্যভিচারী? সে কি নিষ্ঠুর? সে কি ছেনাল? নিজেকে কি ঘেন্না হয় তার আজকাল? সে কী করবে? তার দেহ ভালবাসা চায়। তার মন ভালবাসা চায়। আর মাঝে মাঝে খুব ভালবেসে মরে যেতে ইচ্ছে করে।

গোপালের সঙ্গে দু'দিন দিল্লি ঘুরে এল সে। গাড়িতে চেপে দু'দিনের জন্য বোলপুর। আর নিজের গাড়িটার সঙ্গে আজকাল তার চমৎকার সমঝোতা। কখনও গোপালকে নিয়ে, কখনও একাই অনেকটা চালিয়ে আসে সে। একদিন রুমিদি আর মিমিকে নিয়ে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত ঘুরে এল সে নিজে চালিয়ে।

রুমি বলল, অবাক কাণ্ড! তুই তো জোয়ারের মতোই চালাস! পরাশরের ভাত মারবি নাকি?

বুকে একটু দুরুদুরু ছিলই। সেটা একটু বাড়ল। পিরিয়ডের দিন পেরিয়ে গেল তার। হল না। যদি দেরি করে হয়? তাই দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করল সে। একদিন যায়। দু'দিন যায়। হল না। শরীরে কি কোনও সূক্ষ্ম পরিবর্তন টের পাচ্ছে সে? কোনও মৃদু পদধ্বনি! নিজের পেটে হাত রেখে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, ভেতরে কেউ আছেন? কেউ কি এসেছেন দয়া করে? কোনও ম্যাডাম বা মহাশয়? আপনার জন্যই লাল কার্পেট। আপনার জন্যই মঙ্গলঘট। আপনার জন্যই আম্রপল্লব। আসুন, প্লিজ়...

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

অনেকের গল্প
অসুখের পরে
আদম ইভ ও অন্ধকার
আলোয় ছায়ায়
আলোর গল্প, ছায়ার গল্প
আশ্চর্য ভ্রমণ
উজান
উপন্যাস সমগ্র ১-৭
ঋণ
কাগজের বউ
কালো বেড়াল, সাদা বেড়াল
কীট
কোনও দিন এরকমও হয়
ক্ষয়
গতি
গয়নার বাক্স
গুহামানব
ঘুণপোকা
চক্র
চুরি
চোখ
জাল
ঝাঁপি
দশটি উপন্যাস
দিন যায়
দূরবীন
দ্বিচারিণী
দ্বিতীয় সত্তার সন্ধানে
ধন্যবাদ মাস্টারমশাই
নরনারী কথা
নানা রঙের আলো
নীচের লোক উপরের লোক
নীলু হাজরার হত্যারহস্য
পরিহাটির হরিণ
পারাপার
পার্থিব
পিদিমের আলো
প্রজাপতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম
ফজল আলি আসছে
ফুলচোর
বনদেবী ও পাঁচটি পায়রা
বাঁশিওয়ালা
বিকেলের মৃত্যু
ভুল করার পর
মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক
মানবজমিন
যাও পাখি
লাল নীল মানুষ
শিউলির গন্ধ
শ্যাওলা
সন্ধি প্রস্তাব
সাঁতারু ও জলকন্যা
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
হৃদয় বৃত্তান্ত

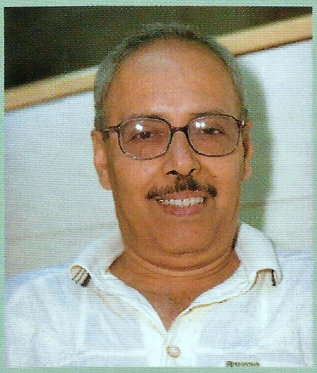

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ২ নভেম্বর, ১৯৩৫, ময়মনসিংহে। শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। পিতা রেলের চাকুরে। সেই সূত্রে এক যাযাবর জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায়। এরপর বিহার, উত্তরবাংলা, পূর্ববাংলা, আসাম। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় কুচবিহার। মিশনারি স্কুল ও বোর্ডিং-এর জীবন। ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে আই.এ.। কলকাতার কলেজ থেকে বি.এ.। স্নাতকোত্তর পড়াশুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কুল-শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। এখন বৃত্তি—সাংবাদিকতা। 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

ছাত্রজীবনের ম্যাগাজিনের গণ্ডি পেরিয়ে প্রথম গল্প—'দেশ' পত্রিকায়। প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা' 'দেশ' শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিরূপে ১৯৮৫ সালে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। এর আগে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। পরেও আরেকবার, 'দূরবীন'-এর জন্য।

'মানবজমিন' উপন্যাসে পেয়েছেন ১৯৮৯ সালের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য এবং সহপ্রতিঋত্বিক।

.....

প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ম্যাডাম ও মহাশয়'
উপন্যাসে জীবনের জটিল ডালপালা।
বাবা রজতশুভ্রর খোঁজ পাবে কি সুমিত?
বুধাদিত্য কি মোহময়ী নন্দিনীর চক্রান্তে
খুন হবে শেষপর্যন্ত? কার জন্য শরীরে
শিহরন জাগে আয়ুষ্মানের? মানবমনের
সমস্ত জটিল পথের শেষে তবু অপেক্ষা
করে থাকে চিরন্তন এক মঙ্গলঘট।

9 789350 403396